শ্রীঅজিতকুমার বসু

প্রিয়বরেষু—

মূল চিত্র-নাট্য হইতে শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উপন্যাসান্তরিত।

এই লেখকের অন্যান্য চিত্রোপন্যাস

ভাবীকাল

অভিযোগ

নতুন খবর

কালো ছায়া

হানাবাড়ি

দাবী

চিঠিখানা পড়া শেষ করে জবা মুখ তুলে চাইলো। ছোট ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে সমস্ত আশ্রম-বাড়িটাই চোখে পড়ছে। স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজমোহনবাবুর ঘরের পাশেই মেট্রণ চারুশীলা রায়ের কামরা। গাছপালার ছায়ায় ঢাকা আশ্রমের উপসনা মন্দিরটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভাল লাগছে না, এসব কিছুই আজ ভাল লাগছে না। পূরো দশটি বছব ধরে চেনা এই ঘর-বাড়ি-মন্দিরের সঙ্গে মনের যোগটা যেন শোভার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। এখানে আর ঠাঁই নেই। যেতে পারলেই যেন আবার সহজ করে নিঃশ্বাস নিতে পারবে, নইলে বুঝি দম আটকে মারা যাবে। হাতেব চিঠিখানার ওপর আর একবার চোখ বুলোবার চেষ্টা কবলো জবা। এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। এই চিঠিই তার পাশপোর্ট, অনিশ্চিতের পথে পাড়ি দেবার পাথেয়।

ঘরে এসে ঢুকলেন নলিনী-দি।

এই বন্দীশালায় জবার একমাত্র বান্ধবী।

—রাতদিন অমন মনমবা হয়ে থাকিস নি জবা, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন নলিনীদি : একটা কিছু কাজ নিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা কর্। শোভা মারা যাবার পর থেকে মেয়েটা যেন তুষের আগুণে জলছে, তাই নিষ্কৃতির একটা উপায় বলে দিতে এসেছিলেন নলিনীদি, কিন্তু তার জবাবটা যে ঠিক এই ধরনের হবে তা ভাবতে পারেন নি।

—'তাই করবো ঠিক করেছি নলিনদি' বলতে বলতে জবা একখানা খবরের কাগজ তুলে ধরলো নলিনীর চোখের সামনে : বিজ্ঞাপনটা একবার পড়ে দেখো। বৃদ্ধ একজন জমিদার ভদ্রলোককে দেখাশুনো করবার জন্তে একটি লেখাপড়া জানা গরিব মেয়ে চেয়েছে। দেখেই একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দেখা করতে ডেকেছে—

—কিন্তু না জেনে না শুনে অচেনা জায়গায় কাজ নেওয়া কি ভালো

হবে ? নলিনী উদ্বিগ্নভাবে চাইলো জবার দিকে। কিন্তু জবার কোন দুশ্চিন্তার পরিচয় পাওয়া গেল না। ম্লান একটু হেসে বললো : কাজ কোথাও নিতেই হবে নলিনদি……আর, সংসারে সবই তো আমার অচেনা জায়গা! নলিনীর দুশ্চিন্তা তবু কমলো না। এতটুকু বয়সে জবা যেদিন প্রথম এখানে এসেছিল সেদিনটির কথা নলিনীর আজও মনে আছে। একটু চুপ করে থেকে বললে : কিন্তু তুমি যে নেহাৎ ছেলে মানুষ! জবা একটু হাসলো, তারপর বিছানার তলা থেকে এক জোড়া চশমা বা'র করে পরে ফেললো। নলিনীর সামনে এসে বললে : এইবার ত্থাখো তো!

জবা কোনদিন চশমা পরে না। তার নূতন রূপ নলিনীর চোখে চমক লাগালো। হাসতে হাসতে বললে : এ আবার কি!

—একটু বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে তো? রীতিমত গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলে জবা।

কম বয়সের জন্যে চাকরিটা হাত ছাড়া না হয় তাই এই সতর্কতা! বুঝতে দেরি হ'ল না নলিনীর। অপ্রসন্ন মুখে বললে : জানি না বাবু… !

তারপর তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মনে হোলো চোখে যেন জল এসে পড়েছে।

জবা চশমাটা খুলে রেখে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। নলিনীদি ব্যথা পেয়েছেন, এটুকু স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু উপায় নেই। মন তার অনেক আগেই স্থির হয়ে গেছে। শোভার মৃত্যুরও অনেক, অনেক আগে। মৃত্যু দিয়ে শোভা শুধু তার সেই সঙ্কল্পটা আরও দৃঢ় করে দিয়ে গেছে। যাবার আগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজমোহনবাবু আর মেট্রণ চারুশীলার কাছে বিদায় নেওয়ার অপ্রিয় কর্তব্যটা সেরে রাখতে হবে। ডাক্তারবাবুকেও একবার বলে যাওয়া দরকার। শোভাকে বাঁচাতে চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নি, আর শোভার মৃত্যুতে জবার পর তিনিই বোধ হয় বড় আঘাত পেয়েছেন।

জবা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং মেট্রণ দুজনকেই দেখা গেল বাগানে পায়চারি

করতে। নিচে নেমে এলো জবা। কোন রকম ভূমিকা না করেই কথাটা বলে ফেললো ব্রজমোহনবাবুর দিকে চেয়ে। ব্রজমোহনের দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে-ঢাকা মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। প্রায় মিনিট খানেক চুপ করে থেকে তিনি বললেন : তোমার ব্যবহারে সত্যি বড় দুঃখিত হলাম জবা। আশা করেছিলাম, এখান থেকে পাশ করবার পর তুমি আশ্রমের সেবাতেই নিজেকে নিয়োগ করবে।

—আশ্রমের মেয়েদের জন্যে আমরা প্রাণপাত করি, তার জন্যে একটা কৃতজ্ঞতা অন্তত থাকা উচিত। ব্রজমোহনের উক্তির বাকিটুকু পূরণ করলেন মেট্রণ শ্রীমতী চারুশীলা রায়।

—কৃতজ্ঞতা যা থাকবার আছে, জবার গলার আওয়াজে এবার কাঠিন্যের পরিচয় পাওয়া গেল : কিন্তু এ আশ্রমে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে আমি থাকতে পারছি না।

—শোভার মৃত্যুতে তুমি অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছ জানি, ব্রজমোহন বললেন দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে : কিন্তু তাব জন্যে কাজ নিয়ে বাইরে যাওয়াটা আমি মোটেই অনুমোদন করতে পারছি না। তুমি এখনও বালিকা। বাইরের সংসারে বিপদ যে কত সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধাবণাই নেই।

জবা নির্বিকার মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ব্রজমোহন আর একবার ভাল করে চাইলেন ওর দিকে।

—তুমি তা হলে এ কাজ নিয়ে যাবেই ঠিক করেছ ?

—হ্যাঁ।

—তা হলে আর আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব এখানেই শেষ। এ আশ্রমে আর তোমার জায়গা হবে না, তা মনে রেখ।

—হ্যাঁ মনে রাখবো। ব্রজমোহন বা চারুশীলা কারও মুখের দিকে চাইবার দরকারও মনে করলো না জবা। কথাটা বলেই চলে এলো।

এত সহজে নিষ্কৃতি পাবে জবা ভাবতে পারে নি। খুশী হয়ে চলে আসছিল

নিজের ঘরে। সিঁড়ির কাছে পৌঁছতেই ঝি বিমলা বললে, ডাক্তারবাবু তোমার খোঁজ করছিলেন দিদিমণি। বলছিলেন, যদি সুবিধে হয়, একবার দেখা করতে বোলো।

আশ্রমের যে অংশটা মেয়েদের এবং কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট সেখান থেকে একটু তফাতে ডাক্তারখানা। তারই সংলগ্ন একখানা ঘরে থাকে অজয় ডাক্তার।

জবা ডিসপেন্সারিতে এসে খোঁজ করলো। ডাক্তারকে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল বুড়ো কম্পাউণ্ডারকে। খবর পাওয়া গেল, অজয় 'কলে' বেরিয়েছে, তবে এখুনি ফেরবার কথা।

জবা :এক মুহূর্ত কি ভাবলো, তারপর বললে: আচ্ছা, আমি পরেই আসবো।

—আজ্ঞে না, আপনার কথাই বলে গেছেন। বলেছেন একটু বসতে। কম্পাউণ্ডার রীতিমত পীড়াপীড়ি সুরু করে দিল। জবা ইতস্তত করছে দেখে বললে: আপনি ভিতরে গিয়েই বসুন না।

ডিসপেন্সারীর পাশ দিয়েই অজয়ের ঘরে যাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো জবা। ডাক্তার বলতেই কেমন যেন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন একটি গোছালো মানুষকে বোঝায়। কিন্তু ঘরের হতশ্রী চেহারাটার মধ্যে পরিচ্ছন্নতাও নেই, গোছানো ভাবও নয়। বিছানার ওপর কতকগুলো ছাড়া কাপড়-জামা, প্যাণ্ট, তারি মধ্যে আবার মোটা মোটা খানকয়েক বই। সমস্ত মিলে যেন বারোয়ারি মেসবাড়ির অবস্থা।

ঘরের মধ্যে চাকর মুকুন্দ কি করছিল। কিন্তু তাকে আর যাই বলা চলুক, ঘর গুছোনো বলা চলে না।

—তুমি এখানে কাজ কর? জবা জিজ্ঞাসা করলে।

—আজ্ঞে, আমিই তো করি। আর তো কেউ নেই। রান্না থেকে সব কাজ আমি করি।

—তা, ঘরদোর এমন অগোছাল কেন?

—আজ্ঞে, গুছোবার জো কি! ডাক্তারবাবু কোথায় কখন কি রাখেন

তার ঠিক নেই। অথচ একটা কিছু হারালে আমারই দোষ। আমি তাই হাতই দিই না।

মুকুন্দর সপ্রতিভ কথাবার্তায় হাসি আসছিল জবার। কিন্তু একটা ধোপদোস্ত শার্ট নিয়ে সে বালিশের তলায় গুঁজে রাখবার চেষ্টা করতেই জবা বলে উঠলো : ওকি করছো, জামাটা নষ্ট হয়ে যাবে যে!

শার্টটা বালিশের তলা থেকে টেনে বার করে জবাই ঠিক করে রাখলো ভাঙা, নড়বড়ে টেবলটার ওপর। পাশ করা ডাক্তার হয়ে মানুষ কি করে এই ভাঙা আসবাবপত্র আর এলোমেলো জিনিসের মধ্যে বাস করতে পারে, কে জানে। নিজেই সে বিছানা-বালিশ সরিয়ে সব গুছোতে সুরু করে দিল। ছাড়া কাপড়-জামাগুলো আনলায় তুলে রাখতে রাখতে বললে :

—তোমার ডাক্তারবাবু তো এখানে একাই থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার জন কেউ নেই বুঝি?

—আজ্ঞে, তা আবার নেই! মুকুন্দ এবার উৎফুল্ল মুখে জবাব দিলে : কত বড় ঘরের ছেলে! বাড়ি, ঘর, জমিদারী···কিছুর কি অভাব আছে?

আশ্চর্য হোলো জবা। শোভার অসুখ উপলক্ষ্য করে অজয়ের কাছে তাকে একাধিকবার আসতে হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারী ছাড়া যে তার অন্য পরিচয় আছে সে খবর নেবার দরকার হয়নি।

—এমন করে এখানে একলা আছেন কেন? জবা আর কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারলো না।

—আজ্ঞে কি আর বলবো। বাপের সঙ্গে বনে না, তাই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। মুকুন্দ এবার একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে কথা বলতে লাগলো : আমার মনিব বটে, তবু হক কথা আমি বলবো। ওঁর বুদ্ধিশুদ্ধি যেন কি রকম।

মুকুন্দর গাম্ভীর্য দেখে জবা হেসে ফেললো। আর ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলো অজয়।

—কি, মুকুন্দর কাছে আমার সুখ্যাতি শুনছেন বুঝি—? আমার

বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর মুকুন্দর কোনকালেই বিশেষ আস্থা নেই, বলতে বলতে পরিচ্ছন্ন বিছানাটার ওপর চোখ পড়লো অজয়ের: কিন্তু একি! ঘরের এ চেহারা হোলো কি করে?

—খুব খারাপ লাগছে? পালটা প্রশ্ন করলে জবা।

—না লাগছে ভালোই। একটু কুণ্ঠিত ভাবে অজয় বলে: কিন্তু অনভ্যাস কিনা, কা'র ঘরে ভুল করে এসে পড়েছি মনে হচ্ছে। যাক, এ আর কতক্ষণ! আমার ওই মুর্তিমান আর আমি ওবেলার মধ্যেই আবার সব নিজেদের মতন করে নেবো।

অজয় মুকুন্দর দিকে চাইতেই লজ্জিত হয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জবা জিজ্ঞাসা করলো: আপনি আমার খোঁজ করছিলেন শুনলাম! কেন বলুন তো?

—খুব জরুরী কিছু নয়। আমার অনধিকার চর্চা আপনি হয়তো পছন্দ করবেন না, তবু জিজ্ঞাসা করছি, আপনি নাকি চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন?

বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই কথাটা বলেছিল অজয়। কিন্তু জবার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বুঝতে বাকি রইলো না, নলিনীদির মারফতেই খবরটা এরি মধ্যে ডাক্তারের কানে পৌঁছেচে। খানিক চুপ করে থেকে জবা বললো: হ্যাঁ।

—হঠাৎ আশ্রম ছেড়ে এভাবে চলে যাচ্ছেন কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—নিশ্চয় পারেন। তবে আমি উত্তর দিতে পারি কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু খোঁজ করেছিলেন কি শুধু এই জন্যেই?

—হ্যাঁ, অন্যায় করে থাকলে মাফ করবেন। তবে আপনাকে আমার কয়েকটা কথা বলবারও ছিল। এক বিষয়ে আমি আপনার কাছে সত্যি অপরাধী। আপনার বন্ধুকে আমি সারিয়ে তুলতে পারিনি, যদিও আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-সাধ্যমত আমি—

শোভার কথাই বলছিল অজয়। জবার চোখ দুটি মুহূর্তের মধ্যে ভারী হয়ে উঠলো, একটু চুপ করে থেকে বললো: ও সব কথা আর তুলবেন না।

অজয় কিন্তু থামলো না।

—এই জন্যেই তুলছি যে, আপনার কোন উপকার যদি করতে পারি তা হলে নিজের কাছে অপরাধ আমার একটু লঘু হবে, সে বলতে লাগলো: আপনি কোথায় কি কাজ নিয়ে যাচ্ছেন জানি না, কিন্তু কাজ নিয়ে আপনি যদি বাইরেই যেতে চান, তা হলে—

—ভালো কাজ দিয়ে আমায় সাহায্য করতে পারেন বলছেন?

অজয়ের কথা শেষ হবার আগেই প্রশ্ন করলো জবা। ঠিক প্রশ্ন নয়, একটু খোঁচাও ছিল বুঝি তার মধ্যে। অজয় কিন্তু সেটা গায়ে মাখলো না।

—কতদূর পারবো জানি না, তবে তাই বলবার চেষ্টা করছিলাম। আমাকে আপনার হিতৈষী বন্ধু বলে যদি অবশ্য আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

শেষ কথাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রত্যাশার সুর ছিল। কিন্তু জবার তরফ থেকে যে জবাব পাওয়া গেল সেটাকে খুব উৎসাহজনক বলা চলে না। জবা বললে: বিশ্বাস করতে আমার কোন বাধা নেই। তবে আপাতত তার দরকার হচ্ছে না। যে কাজ আমি পেয়েছি তাই এখন আমার পক্ষে যথেষ্ট।

মৌখিক একটু ধন্যবাদ জানাল জবা, তারপর নমস্কার করে চলে এল নিজের ঘরে।

এতক্ষণ কেমন একটা উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল এই চাকরির কল্পনা আর উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যে। এখন উদ্যোগ পর্ব চুকলো, নিজের সামান্য ক'টা জিনিস গুছিয়ে নিয়ে সেই কর্মস্থলের দিকে বেরিয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু হঠাৎ কেমন একটা নিঃসঙ্গতার নিরুৎসাহ তার মনটাকে আস্তে আস্তে ছেয়ে ফেলতে লাগলো। ঝড়ের মুখে ছেঁড়া-পাতা যেমন ঘুরতে ঘুরতে উঠোনে এসে পড়ে, একদিন ঠিক সেইরকম করে সে এই আশ্রমে এসে পড়েছিল। তারপর, একটি দুটি দিন বা মাস নয়, বছরের পর বছর কেটেছে এই আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে। শোভাকে পেয়েছে, ভালবেসেছে, হারিয়েছে। বলতে গেলে নিজেকে, এই পৃথিবীকে

চিনেছে এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে থেকে। আজ পরিচিত গণ্ডীর সঙ্গে ছেদ। হয়তো আর কোনদিন আসবে না এখানে, দেখা হবে না এদের সঙ্গে। মনটা কি ঝিমিয়ে পড়ছে শুধু সেই জন্যে ?

কি জানি। ঠিক বুঝতে পারলো না। এলোমেলো এই ভাবগুলোর মধ্যেই কখন যেন নিজের জিনিস কটা গুছিয়ে নিল। কখানা শাড়ী-ব্লাউস, আর বই। হঠাৎ মনে পড়লো সাধনদাকে। এই আশ্রমেই পিওনের কাজ করতো সাধন। সামান্য মাইনে, কিন্তু মনটা ছিল অসামান্য। একমুহূর্তে জবাকে আপনার করে নিয়েছিল। নইলে জবা এখানে টিকতে পারতো না। সেই সাধনদার একদিন চাকরি গেল। তারপর গেল শোভা।···কোথায় আছে সাধনদা কে জানে।

অন্যমনস্কের মতো জবা খোলা জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ালো। বাগানটা চোখে পড়ছে এখান থেকে। সেই গাছটা—যার গুঁড়িতে শোভা আর সে নিজেদের নাম লিখেছিল, তাদের বন্ধুত্বকে অক্ষয় করে রাখবার কল্পনায়। শোভা নেই। কিন্তু গাছের গুঁড়িতে খোদাই-করা নাম দুটো রয়েছে। আজকের পর জবাও থাকবে না এখানে, কিন্তু গাছটা থাকবে, ওদের নাম দুটোও থাকবে···কিন্তু কতদিন ? বোধ হয় যতদিন গাছটার পরমায়ু। তারপর—? তারপর কি হবে কে জানে !

ছেঁড়া-পাতার মতো তাকেই যে এই আশ্রমে এসে পড়তে হবে, তাও কি ছেলেবেলায় কোনদিন জবা ভেবেছিল ! বাপ-মার কথা ভাল মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁরাও কি কোনদিন তাঁদের একমাত্র মেয়ের এমনি জীবনের কথা কল্পনা করতে পেরেছিলেন ?

জবা কিন্তু স্মৃতি আর কল্পনা মিশিয়ে তার ছেলেবেলার দিনগুলোকে এখনও মনে করতে পারে। বাপ-মার একটি মাত্র মেয়ে। একটু বেশী আবদার-উপদ্রব করতো, চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু না পেলে বায়নার অন্ত রাখতো না, এগুলো এখনও নিজেরই মনে পড়ে। মনে পড়লে হাসিও পায়। আবার তখুনি চোখে জল আসে। কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। বাবা একদিন হাসপাতালে গেলেন, সেখান থেকে ফিরলেন না। মা হাতের চুড়ি

খুললেন, সিঁথির সিঁদুর মুছলেন, কি যে হোলো জবা বুঝতেই পারলে না। শোনা গেল, বাবা আর ফিরবেন না।

জবাকে নিয়ে মা এলো মামার বাড়িতে। মামা খুব ভাল বাসতেন জবাকে। ঠিক নিজের ছেলেমেয়ের মতো। নিজে কাছে বসিয়ে জবাকে লেখাপড়া শেখাতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর মা যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলেন। জবাকে আদর-যত্ন করার কথা তাঁর মনে থাকতো না। বসে বসে দিনরাত কি যেন ভাবতেন। মামা কিন্তু আপত্তি করতেন। বলতেন, যা হবার তাতো হয়েই গেল। ভেবে কি করবি বল্? মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে না, সে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে না?

খুব ভাল লাগতো মামার কথাগুলো। বলতে গেলে পড়াশুনোর ঝোঁক মামাই ওর মনে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। পড়ার বই, ছবির বই···এসব পেলে জবা আর কিছু চাইতো না। 'নিজের পায়ে দাঁড়ানর' মানে বোঝার বয়স হয়নি তখনও, কিন্তু লেখাপড়া শিখতে হবে এটুকু জবা বুঝতে পারতো। সময় পেলেই পড়তো। মামাতো ভাই প্রতুল আর মামাতো বোন রেখা কি ঠাট্টা তামাসাই করতো এই জন্যে! জবা গায়ে মাখতো না। মামাকে বললেই তার সব অভাব-অভিযোগের, প্রতিকার হয়ে যেত। হাসিমুখে কোলের কাছে টেনে নিয়ে জবাকে তিনি নিজে সব শক্ত শক্ত পড়াগুলো বুঝিয়ে দিতেন।

কিন্তু এ সুখ তার কপালে সইলো না। মা হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর মামাও। আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর চেহারাটাই যেন জবার কাছে বদলে গেল।

মামা আর মা যেন এতদিন মামীমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। মামীমার তরফ থেকে এতকাল প্রশ্রয় খুব বেশী পাওয়া যায় নি, তবে বাইরে থেকে কোন বিরাগের পরিচয়ও পাওয়া যেত না। তিনি বেশীর ভাগ সময় সংসারের কাজকর্ম নিয়ে থাকতেন। জবার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বললেই হয়। জবার মা যখন মারা গেলেন তার পরেও ঠিক ওইভাবেই

চলতে লাগলো। মার অভাবটা বরং পূরণ করেছিল মামার বাড়ির পুরনো ঝি চপলা। পড়তে পড়তে জবা ঘুমিয়ে পড়লে সেই তুলে খাওয়াতো, খাওয়া হলে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতো। কিন্তু মামার মৃত্যুর পর মামী পুরবালা আড়ালটা ঘুচিয়ে একেবারে সামনা-সামনি এসে দাঁড়ালেন। মামার অবস্থা খুব ভাল না হলেও মোটামুটি স্বচ্ছল বলা চলতো। পুরবালা শক্ত হাতে এই সংসারে হাল ধরলেন, আর সেই সঙ্গে নানারকম পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। প্রথম ছোটখাট কয়েকটা ব্যাপার দিয়ে আরম্ভ হোলো। জবার বাটিতে দুধের পরিমাণটা কমলো, জলীয় ভাগটা বেশী হতে লাগলো। প্রতুল আর রেখার জল খাবারটা পুরবালা নিজের ঘরে আলাদা করে দিতে লাগলেন। প্রতুল ভাত-তরকারি ফেলে উঠে গেলে পাত কুড়িয়ে জবার থালায় তুলে দেওয়া সুরু হোলো। এইরকম চললো কিছু দিন।

তারপর সুরু হোলো পড়াশুনো নিয়ে বকা-ঝকার পালা।

"এতটুকু মেয়ে, দিবারাত্রি বই মুখে করে বসে থাকা...দেখতে পারিনে দু'চক্ষে।"

"বলি চাকরি করবে, না, লেখাপড়া শিখে জজ-ম্যাজিস্টের হবে? খালি বই আর খাতা, খাতা আর পেন্সিল! পারিনে বাবু, অতশত ফাইফরমাস জোগাতে।"

এমনি করে পর্দা ক্রমশ চড়তে লাগলো। উদারা থেকে মুদারা, তারা। পুরবালার কেমন একটা ধারণা হয়ে গেল, এই হতভাগা মেয়েটাই তার যত দুর্দশার মূল।

"এই বয়সে বাপকে খেলে, মাকে খেলে, জলজ্যান্ত মামাকেও খেয়ে নিশ্চিন্তি হোলো। পোড়াকপালীর কোথাও ঠাঁই নেই, আমি বলে তাই এখনও—"

পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে পুরবালার এই ধরনের দু'চারটে মন্তব্য শোনা যেতে লাগলো। কিছু কিছু জবা নিজের কানে শুনতো, কিছু কানে আসতো চপলার মুখ দিয়ে। বয়েস হয়েছিল চপলার, কথার খেই ঠিক রাখতে পারতো না সব সময়; জবাকে সহানুভূতি জানাতে গিয়ে পুরবালার

কথাগুলো তার কাছে বলে ফেলতো। জবা বুঝতে পারতো না তার দোষটা কোথায়। মনটা খারাপ হয়ে যেতো। বসে বসে ভাবতো। কি তার উচিত ঠিক করে উঠতে পারতো না কিন্তু মনটা, তার এমনি করেই সেই ছোট বেলা থেকে আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে উঠতে লাগলো।

কাটলো আরও কয়েকটা মাস।

তারপর পুরবালা যেন স্বাভাবিক ভদ্রতাটুকুও হারিয়ে ফেললেন, আর তাঁর ফলে সমান পাল্লায় যোগ দিল তাঁর ছেলেমেয়ে দু'টি।

রেখা আর প্রতুল হয়তো খেলা করছে, জবা গিয়ে পড়লো তাদের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে রেখার মুখ ভার হয়ে গেল কিংবা প্রতুল লাগলো ভেংচি কাটতে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দু'জনেই সরে গেল সেখান থেকে কিছু একটা ছল-ছুতো করে। জবার জন্যে জামা কেনা তো উঠেই গেল, রেখার ছেঁড়া ফ্রকগুলো তালি আর সেলাই যুক্ত হয়ে জবার গায়ে উঠতে লাগলো। তারপর পুরবালা স্থরু করলেন ফাইফরমাস খাটাতে। প্রতুল ময়লা জামা-প্যাণ্ট পরতে পারে না, আবার নোংরাও করে খুব ঘন ঘন। সেগুলো জবাকেই সপ্তাহে দু' তিন বার কেচে পরিষ্কার করে রাখতে হয়। চপলার অনুপস্থিতিতে ঘর ঝাঁট দেওয়া, দু'একখানা বাসন মেজে নেওয়া, এ সব তো আছেই। বাসন ভাল পরিষ্কার না হলে মারও খেতে হয় মাঝে মাঝে।

চপলা দেখতে পেলে অনুযোগ করে।

'ওমা, আমি থাকতে ছোট দিদিমণিকে দিয়ে এসব করান কেন?'

'বকিস নি। গরীব-দুঃখীর ঘরের মেয়ে। দু'দিন পরে শ্বশুর ঘর করতে যাবে। কাজ কর্ম শিখতে হবে না।'

দিন কয়েক পরে আর এক পর্দা চড়লো। তারপরেই সমস্ত কিছু যেন অসহ্য হয়ে উঠলো জবার কাছে।

সে দিনটির কথা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবে না। মামার শোবার ঘরের আলমারিতে বই ছিল অনেক। আগে আলমারিটা খোলাই থাকতো, খুশি মতো একখানা বই টেনে নিয়ে ছবি দেখতো জবা। পড়বার

মতন বিদ্যেবুদ্ধি তখনও হয় নি। মামা মারা গেলেন, আলমারীতেও চাবি পড়লো। সেদিন কিন্তু ঘরে ঢুকে জবা দেখলো আলমারিটা খোলা। মামীমা বোধহয় চাবি দিতে ভুলে গেছেন। শুধু তাই নয়, ঘরের মধ্যে কেউ নেই, কাছাকাছিও না। কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠলো। কতদিন ছবি দেখেনি। অসুখে পড়বার দিন মামা নতুন ক'টা বই এনেছিলেন। সেগুলো দেখা হয় নি। আজ এই ফাঁকে সেগুলো দেখে নিলে কেমন হয়?

দেরী করলো না জবা। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে সন্তর্পণে আলমারির একটা পাল্লা খুলে ফেললো। নতুন বইগুলোর গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে আলমারির ভেতরটা। জবা একখানা বই টেনে নিয়ে চলে গেল ঘরের একটি কোণে—বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলে এদিকটায় চোখ পড়ে না। নিরিবিলি জায়গাটিতে গিয়ে পাতা উল্টাতে লাগলো জবা। পাতায় পাতায় ছবি, দেশবিদেশের গল্প। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় ঝগড়া করতে করতে ঘরে ঢুকলো রেখা আর প্রতুল।

—আমার ফিতেটা দাও বলছি।

—যাঃ যাঃ, তোর ফিতে, নাম লেখা আছে যেন! মুখ ভেংচে জবাব দিল প্রতুল: আমি কুড়িয়ে পেয়েছি জানিস।

—হ্যাঁ, কুড়িয়ে পেয়েছ! মাকে বলে দেবো দেখবে?

নিরুপায় রেখা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো। কিন্তু তাতেও কোন ফল হোলো না। অযথা প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে মার সম্বন্ধে প্রতুলের মনে আর ভয় থাকবার কথা নয়। সে বেশ জোর গলাতেই জানালো: ঈস্! দে না বলে। মা যেন আমায় ফাঁসি দেবে!

রেখা আর প্রতুলের গলার আওয়াজ পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো জবা। সরে গিয়ে বসলো পর্দার আড়ালে।

ঝগড়ায় হেরে গিয়ে রেখা তখন প্রায় ফোঁপাতে সুরু করেছে।

—ও! ভারি মায়ের আদুরে ছেলে হয়েছে!···যাচ্ছি আমি মায়ের কাছে।

কিন্তু প্রতুল এদিকে জবাকে দেখতে পেয়েছে। রেখার সঙ্গে আপোষ করে নিতে তার দেরি হোলো না।

—এই দাড়া, মজা দেখে যা।

এগিয়ে গিয়ে পর্দটা সরিয়ে ফেললো প্রতুল। তারপর জবার দিকে চেয়ে চোখ কটমট করে বললে: এখানে কি করছিস?

—আমি? আমি তো বই পড়ছি।

একটু ভয় পেলেও জবা সাহস করে জবাব দিল।

—বই! কোথা থেকে চুরি করেছিস?

প্রতুলের ভাবভঙ্গী, গলার স্বর প্রায় গোয়েন্দা পুলিশের মত। জবা কিন্তু ঘাবড়ালো না।

—চুরি করবো কেন! আমি তো আলমারী থেকে নিয়েছি।

—কেন নিয়েছিস? জানিস, ওসব বই আমার।

—আমারও না দাদা? প্রতুলের কথার সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলো রেখা।

প্রতুল বললে: হ্যাঁ, আমাদের বাবার বই।

জবা তবু অপরাধ স্বীকার করতে রাজী নয়, বলে: আমি তো শুধু একটু ছবি দেখছিলাম।

—যা যা, আর ছবি দেখতে হবে না।

এক টানে প্রতুল বইখানা জবার হাত থেকে কেড়ে নিল।

—একটু খানি দেখি ছোড়দা। সত্যি বলছি আমি কিচ্ছু করবো না, একটুও নষ্ট করবো না।

এত বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতুলের মন গলানো গেল না। বইখানা আলমারিতে তুলে রাখতে রাখতে জবার গলার আওয়াজ নকল করে ভেংচে উঠলো প্রতুল: একটুও বই নষ্ট করবো না! তোকে বই দিচ্ছে কে!

—একটু বই পড়তে দেবে না, তোমাদের সঙ্গে খেলতে দেবেনা, তা হলে আমি করবো কি!

অভিমানে আর অপমানে জবার চোখে জল এসে পড়লো।

তাতেও কিন্তু ভাই-বোন দু'টির মন ভিজলো না।

রেখা বললে: কি আবার করবি! ঝি গিরি!

—ঝি-এর মতন বাসন মাজবি, জল তুলবি, পাদ পূরণ করলে প্রতুল।

জবার আর সহ্য হল না। প্রায় চিৎকার করে বললেঃ ঝি ঝি কোরো না বলছি।

—ঈস্! বেশ করবো ঝি বলবো, কি করবি তুই? এই ঝি!—বলতে বলতে প্রতুল জবাকে একটা ধাক্কা মারলো।

এসব ব্যাপারে ভাই-বোন একেবারে অভিন্নহৃদয়। রেখাও সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলোঃ এই ঝি!

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের প্রাণখোলা হাসি!

হাসির ধমক থামতেই প্রতুল আবার একটা ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু জবার মুখচোখের অবস্থা ততক্ষণে বদলে গেছে, সহ্যের বাঁধ গেছে ভেঙ্গে। প্রতুল এগিয়ে আসতেই জবা প্রাণপণ শক্তিতে প্রতুলকেই একটা ধাক্কা দিল। ব্যাপরটা এমনি আচমকা ঘটলো যে প্রতুল 'টাল' সামলাতে না পেরে মেজের ওপর পড়ে গেল। জবাব মাথাব রক্ত তখন গরম হয়ে উঠেছে। বনবেড়ালের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রতুলের ওপর, কিল-চড়-ঘুঁসি মারতে মারতে বলতে লাগলোঃ আব ঝি বলবে? বলবে ঝি!

এমন বেকায়দায় প্রতুল জীবনে কখনও পড়েনি। জবা হাঁটু গেড়ে বসেছে প্রতুলের বুকের ওপর, ওঠবাব পর্যন্ত উপায় নেই। নিরুপায় প্রতুল চিৎকার স্থরু করে দিলঃ ওগো, মা-গো, মেরে ফেললো গো—

বাকিটুকু বললো রেখাঃ ও-মা, শিগগিব এসো, দাদাকে খুন কবে ফেললে—

চেঁচামেচি শুনে ছুটে এলো চপলা। জবা তখনও প্রতুলেব বুকেব ওপব বসে। হাত দুটো ধরে তাকে টেনে তুলে চপলা জিজ্ঞেসা করলেঃ কি, হয়েছে কি?

—ও কেন আমায় মারলে, ঝি বললে।

গজরাতে গজরাতে জবাব দিল জবা। কিন্তু চপলাব মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে।

—ছি, ছি, ছোড়দিমণি, দাদাবাবুকে তুমি মাবছিলে! এত দুঃখু পেয়ে, এত মার খেয়েও তোমার শিক্ষা হোলো না! এখন মা শুনলে কি বলবে!

সেজন্য বেশীক্ষণ ভাবতে হোলো না। পুরবালা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন।

—অত চেঁচামেচি কিসের? কি হয়েছে চপলা?

—কিছু হয় নি মা, খেলতে খেলতে একটু ঝগড়া হয়েছে। ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করে চপলা।

কিন্তু প্রতুল তাতে রাজী হবে কেন?

—না মা, ওই জবা মুখপুড়ি আমায় কি করেছে দেখ—আমার চুল ছিঁড়ে নিয়েছে, খিমচে রক্ত বের করে দিয়েছে।

রেখাও বললে সঙ্গে সঙ্গে: আমাকেও খিমচে দিয়েছে মা।

—মিথ্যে কথা। প্রতিবাদ করলো জবা: তোমায় আমি কিছু করি নি।

সে প্রতিবাদ আর যার কাছে হোক, পুরবালার কাছে গ্রাহ্য-হবার মতন নয়: চুপ করো পাজী বদমায়েস মেয়ে কোথাকার। কথায় কথায় আমার ছেলেমেয়ের গায়ে তুমি হাত দাও! রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতে হ'ত, তার বদলে বাড়িতে আদর করে রেখেছি বলে তোমার এত আস্পর্দা বেড়েছে।

শুধু মুখের কথায় রাগটা বোধ হয় পূরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছিল না, পুরবালা এবার ঠাস ঠাস করে গোটা কতক চড় বসিয়ে দিলেন জবার গালে। মেয়েটা কিন্তু কাঁদলো না, মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে। পুরবালার মনে হোলো, মেয়েটা তাকে গ্রাহ্য করতে রাজী নয়।

দাঁড়াও তোমার হেস্ত নেস্ত আমি আজিই করছি। বলতে বলতে তিনি জবার ডান হাতটা ধরে তাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে চললেন। উৎফুল্ল মুখে প্রতুল আর রেখা ছুটলো তাদের পিছনে পিছনে! আর বুড়ো ঝি চপলা মনে মনে কাঁপতে লাগলো মেয়েটার 'অদেষ্টে আজ কি খোয়ার লেখা আছে' তাই কল্পনা করে।

বাড়ির একটা ছোট ঘরে যতরকম ভাঙাচোরা জিনিসপত্র, কাট কুটো জড় করা থাকতো। ঘরটা বছরে তিন চার দিনের বেশী খোলবার দরকার হ'ত না, একটি মাত্র জানালা, তাও সব সময় বন্ধ। পুরবালা জবাকে

টানতে টানতে নিয়ে এলেন সেই ঘরখানার সামনে। আঁচলের চাবি দিয়ে দরজাটা খুললেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধ হাওয়ার সঙ্গে খানিকটা ভ্যাপসা গন্ধ বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। পুরবালা সেই ঘরের মধ্যে জবাকে ঠেলে দিলেন, নিজেও ঢুকলেন তার পিছনে পিছনে। বললেন : আজ সারাদিন তোমার খাওয়া বন্ধ, এই ঘরে তুমি বাঁধা থাকবে।

তবু ভয় পেলো না মেয়েটা। ঠিক আগের মত জোর গলায় জবাব দিল : কেন বাঁধা থাকবো? মামাবাবু নেই বলে তোমরা আমায় যা খুশি তাই কর।

—কি, এক রত্তি মেয়ের এত তেজ! পুরবালার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ে : আচ্ছা, দেখি তোমায় টিট করতে পারি কি না—

একতাল নারকেল দড়ি পড়েছিল ঘরের একটা কোণে। তাই দিয়ে পুরবালা জবার হাত পা বেঁধে ফেললেন, তারপর ভাঙ্গা একটা চৌকির ওপর তাকে ঠেলে দিয়ে বললেন : থাক্, ওইখানে বসে থাক। এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেব না।

রেখা আর প্রতুল চৌকাঠের কাছ থেকে চোখ বড় বড় করে মার এই শাসনপ্রণালীর তারিফ করে উঠলো : ঠিক হয়েছে, খাসা হয়েছে!

শুধু মাকে অভিনন্দন জানিয়ে ক্ষান্ত হ'তে পারলো না ওরা।

জিভ বার করে জবাকে ভেংচিও কাটলো। জবাও তাদের পাল্টা ভেংচালো।

—ওই দেখ মা! আমাদের জিভ ভেঙাচ্ছে!

রেখা চেঁচিয়ে উঠলো। পুরবালার মনটা বোধ হয় কর্তব্য সম্পাদনের আনন্দে ভরে ছিল, তিনি শুধু বললেন : তোরা এখন চল দেখি। সারা দিন শুকিয়ে থাকলে জিভ আপনি বেরিয়ে আসবে।

ছেলে-মেয়ের হাত ধরে তিনি বিজয় গর্বে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে এসে দরজার শিকলটা তুলে দিতে ভুল হোলো না।

দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরটা গাঢ় অন্ধকারে যেন ডুবে গেল। বিশ্রী গন্ধ আসছে কোথা থেকে। হয়তো ইঁদুর মরেছে, কিংবা

আর্সোলা। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই জবার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। একটু বাতাস আসবার উপায় নেই ঘরখানার মধ্যে। কিছুক্ষণ কাটবার পর জবার মনে হতে লাগলো, এর বাইরে কি সত্যই কোন পৃথিবী আছে? বইয়ের ছবির মতো সুন্দর সুন্দর দেশ, ভাল ভাল ঘরবাড়ি··· যেখানে শুধু আলো আর আলো, পাখির ঝাঁক, ফুল, নদী, পাহাড়···? কে জানে! এ ঘরখানার মধ্যে বসে সে সব যেন ভাবাও যায় না। জবার মনে হয়, সে যেন আর কোন দিন এর বাইরে যেতে পারবে না। এই দুর্গন্ধ, অন্ধকার ঘরের মধ্যেই একদিন দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে, পড়ে থাকবে পচা ইঁদুরগুলোর মতন, তারপর একদিন কোথায় টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসবে···

এমনি সম্ভব অসম্ভব কত কি ভাবতে ভাবতে খিদে আর তেষ্টায় মাথার ভেতরটা যেন ঝিম ঝিম করতে লাগলো। তার পর কিছু ভাববার ক্ষমতাই যেন রইলো না। বাইরে থেকে রেখা আর প্রতুলের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। ওরা হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, যেন কিছুই হয় নি বাড়িতে। মামীমা ওদের স্নান করে খেতে নিতে বললেন। যেটুকুও শোনা গেল। তারপর, সব যেন চুপচাপ। দুর্গন্ধে জবার গা বমি করতে লাগলো, মনে হ'ল চৌকি থেকে পড়েই যাবে বুঝি। কিন্তু না, সে রকম কিছু ঘটলো না। অবসন্ন শরীরে জবা কখন এক সময় সেই চৌকিটার ওপরেই গড়িয়ে পড়লো, চোখে ঘুম নেমে এলো···নিজেই ঠিক বুঝতে পারলে না।

অনেকক্ষণ পরে—কতক্ষণ পরে কে জানে, বাইর থেকে যেন খুট করে শিকল খোলার আওয়াজ হোলো। সেই আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথমটা জবা ভাবলো স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু স্বপ্ন নয়। বন্ধ দরজাটা আস্তে আস্তে একটু ফাঁক হোলো আর সেই ফাঁক দিয়ে আবছা একটু আলো ঢুকলো ঘরে···আর সেই সঙ্গে জড় সড় হয়ে সন্তর্পণে যে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো তাকে চিনতে দেরী হবার কথা নয়।

চাপা গলায় চপলা ডাকলোঃ ছোড়দিদিমণি, ও ছোড়দিদিমণি—

দুপুরবেলা কাজকর্ম সেড়ে ওপরে উঠে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেওয়া পুরবালার চিরকালের নিয়ম। সেই ফাঁকে চপলা ওর খোঁজ নিতে এসেছে, জবার বুঝতে বাকি রইলো না। কিন্তু সর্বাঙ্গে এমন অসহ্য যন্ত্রণা, মনের মধ্যে এমন অস্বস্তি···একটা সাড়া দেওয়ার ইচ্ছে পর্যন্ত হোলো না।

চপলা আরও দু'পা এগিয়ে এসে বললো, তোমার জন্যে খাবার এনেছি। এস খাইয়ে দিই—

—না আমি খাব না। কেন আমায় বেঁধে রেখেছে! আমি তোমার হাতে খাব না।

চপলা রাগ করলো না, ক্ষুণ্ন হল না। অভিমানের এমন চেহারা সে আজ নতুন দেখছে না। চৌকির একেবারে কাছটিতে এসে চপলা বললে: লক্ষ্মী দিদিমণি, খেয়ে নাও। আচ্ছা, আমি না হয় ততক্ষণ তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি। খাওয়া হলে আবার বেঁধে দেব। জানতো, মা জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না।

নিজের পয়সা দিয়ে দোকান থেকে খাবার কিনে এনেছিল চপলা। এটুকু খাইয়ে যেতে না পারলে তার স্বস্তি নেই। খাবারের ঠোঙাটা চৌকির ওপর রেখে চপলা জবার হাত পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিতে স্নুরু করলো। কিন্তু জবার কপালে সেদিন এ বাড়ির অন্ন বুঝি লেখা ছিল না। দড়িগুলো খোলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলো প্রতুল আর রেখা। পুরবালা ঘুমুতে গেলে কি হয়, ওদের চোখে সারাদিন ঘুম আসে না।

ওরা ঘরে ঢুকেছিল জবা কি করছে তাই দেখতে। ঘরের মধ্যে চপলাকে দেখে ওরা আশ্চর্য হোলো। প্রতুল সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো: ওকি হচ্ছে চপলা! মাকে ডেকে দেব দেখবে?

বিপদের আশঙ্কা মানুষকে বুঝি নিজেই সাবধান করে দেয়। ওরা ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জবা হাত দুখানা এমন করে পিছনে রাখলো যেন তখনও সে দুটো বাঁধাই আছে। চপলাও খাবারের ঠোঙাটা তুলে

আঁচল চাপা দিয়েছে। প্রতুলের কথার জবাবে সে ঝাঁঝিয়ে উঠলো : কি আবার বলে দেবে? আমিতো শুধু দেখতে এসেছি।

খাবারের ঠোঙাটা আঁচলের তলাতেই চাপা রইলো। আজ আর মেয়েটার খাওয়াই হোলো না। আপন মনে গজ গজ করতে করতে ক্ষুণ্ণ মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চপলা। দস্যি ছেলেমেয়ে দুটোর কি দুদণ্ড মায়ের কাছে ওপরে থাকতে নেই!

কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটোকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি! ওর মাও ঘুম ভেঙ্গে নেমে এলো নিচে।

ঘরের মধ্যে রেখা আর প্রতুল তখন আবার জবাকে খেপাতে সুরু করেছে। জবা মুখ ভার করে চৌকির ওপর বসেছিল। প্রতুল ডাকল : এই ঝি!

রেখা বলল : আর আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবি?

জবার তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

প্রতুল আবার ডাকল : এই ঝি! ঝি!

জবার চোখ দুটো আবার সেই সকাল বেলার মত বড় বড় হয়ে উঠলো। মনে হোলো আবার বুঝি সে প্রতুল কিংবা রেখার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলো না। দাঁতে দাঁত দিয়ে চুপ করে বসে রইলো জবা।

তাতেও নিস্তার নেই।

রেখা ওর চুলের গোছাটা ধরে জোরে টেনে দিল। প্রতুল একটা চিমটি কাটলো। মুহূর্তের মধ্যে জবা যেন কি একটা ঠিক করে ফেললে। মুখ-চোখ আরও কঠিন হয়ে উঠলো। তারপর নিমিষের মধ্যে প্রতুল আর রেখাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রেখা আর প্রতুল অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এক সেকেণ্ড। তারপর তারাও ছুটলো ওকে ধরবার জন্যে।

ঘর থেকে বের হলেই লম্বা বারান্দা। বারান্দাটুকু পার হলেই সদর রাস্তায় যাবার দরজা। জবা উর্ধ্বশ্বাসে সেই দিকে ছুটতে লাগলো।

দরজাটা খোলাই ছিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জবা সেই অন্ধকূপ থেকে একেবারে বড় রাস্তায় এসে পড়লো। এ রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল খুব কম। কাজেই রাস্তায় নেমেও থামবার দরকার হোলো না। হাতের মুঠি দুটো শক্ত করে জবা শুধু ছুটতে লাগলো। ছুট, ছুট, ছুট ....

এদিকে প্রতুল ততক্ষণে বারান্দায় বেরিয়ে চেঁচাতে স্বরু করেছে:

—ওমা! মা! শিগগির এস। দেখে যাও—

ঘুম থেকে উঠে পুরবালা নির্চেই আসছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন: কী হযেছে কী? ডাকাত-পড়া চেঁচাচ্ছিস কেন?

রেখা বললে: জবা মুখপুড়ি পালিয়ে গেল!

পালিয়ে গেল! —পুরবালার কাঁচা-ঘুমভাঙ্গা ভারী মুখখানা আরও ভারী হয়ে উঠলো: কে তাকে খুলে দিল?

প্রতুল বললে: আমরা জানি না।

পুরবালা একটু তাড়াতাড়ি বাকি ক'টা ধাপ পার হয়ে বোধ হয় সদবের দিকেই যাচ্ছিলেন, দেখা গেল, চপলা ঢুকছে হাঁফাতে হাঁফাতে।

—কি হবে মা, ছোড়দিদিমণি ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। ধরতে পারলাম না।

জবাকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখেই সে তাকে ফেরাতে গিয়েছিল, কিন্তু মেয়েটা চক্ষের নিমিষে এ-গলি ও-গলি পাব হযে কোথায় যে গেল, চপলা কিছু বুঝতেই পারলে না।

চপলা সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে খবর দিতে এসেছিল। কিন্তু এখানে কারও কোন দুশ্চিন্তা দেখা গেল না।

পুরবালা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: দরকার নেই ধরবার, ও জ্বালা বিদেয় হলেই বাঁচি।

—আহা, ষাট, ... আমি আব একবার দেখে আসি মা!

পুরবালা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন: না, না, অত আদিখ্যেতার দরকার নেই। পেটের জ্বালা উঠলে আপনিই আসবে। রাত হোক না, সুড় সুড় করে ফিরে আসবে।
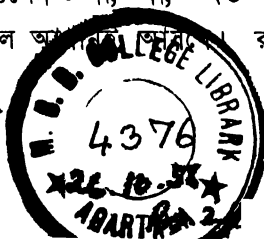
বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে হোলো। তারপর রাত। সে রাত আবার গভীর থেকে গভীরতর। কিন্তু জবা বলে মেয়েটাকে 'সুড় সুড় করে' এ-বাড়িতে ফিরে আসতে দেখা গেল না। চপলা শুধু উতলা হয়ে বার বার ঘরে বাইরে ছুটোছুটি করলে। মেয়েটার খোঁজ পাওয়া গেল না।

এ-গলি ও-গলি পার হয়ে জবা একটা পার্কের কাছে এসে দাড়ালো। বিকেল বেলা। পার্কের ভেতর অসংখ্য মানুষ আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ভিড়। একটা বেঞ্চিতে বসে হাঁফাতে লাগলো জবা। ভীষণ খিদে পেয়েছে, মাথাটা যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। বেলা পড়ে এলো, জবা তবু সেইখানেই বসে রইলো। মামার বাড়িতে আর ফিরবে না, এটা সে অনেক আগেই ঠিক করে ফেলেছে। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ ঢুলে আসতে লাগলো। তবু মামার বাড়ি যাবার কথা ভাবতে পারলো না। ওটা যেন বাড়ি নয়—মস্ত বড় অন্ধকার একটা গর্ত। আর সেই গর্তের মধ্যে যারা থাকে তারা মানুষের মতো দেখতে হলে কি হয়, ঠিক মানুষ নয়—বাঘ-ভাল্লুক,..... কিংবা ওই ধরনের অন্য কোন জানোয়ার; এক চপলা ছাড়া। ওখানে ফিরে গেলেই তারা যেন তাকে ঘিরে ধরবে, তারপর একটু একটু করে তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। এমনি কত কি ভাবতে লাগলো জবা বসে বসে। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে শীত করতে লাগলো। গায়ে তালি-মারা একটা ছিটের জামা ছাড়া আর কিছু নেই। কুয়াশায় চারিদিক অস্পষ্ট হয়ে উঠলো। লোকজন কমতে লাগলো। রাত কত হয়েছে। তার কোন হিসেব নেই। কাঁপতে কাঁপতে জবা উঠে পড়লো। এবার একটা শোবার মতন গরম জায়গা খুঁজে নিতে হবে।

জবা আবার গলির গোলক ধাঁধা ভেদ করে এগিয়ে যেতে লাগলো। বেশীক্ষণ ঘোরবার ক্ষমতাও আর নেই। একটা বাড়ির দরজার ওপর বসে হাঁফাতে লাগলো। এদিক ওদিক চেয়ে ভাবতে লাগলো কোথায় শোয়া যায়। মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, কারা যেন এই দিকেই আসছে। হ্যাঁ, জন দুই লোক। না, তার চেনা কেউ নয়। কিন্তু লোক দুটো বার

বার এমনভাবে জবার দিকে চাইছে, জবা ভয় পেয়ে গেল। লোক দুটো এগিয়ে আসতেই সে উঠে অন্য একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

খানিকটা যেতেই দেখে একটা লোক বিড় বিড় করে কি বকছে আর কট মট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। লোকটার মাথায় একটা শোলার সাহেবী টুপি—ময়লা, তোবড়ানো, পরনে একটা ছেঁড়া কাপড় আর তার ওপর গায়ে জড়ানো একটা ছেঁড়া মোটা চট। হাতে একটা ভাঙা লাঠি, বন বন করে ঘোরাচ্ছে, আপন মনেই কি যেন বলছে আর জবার দিকে চাইছে। কাছাকাছি আসতে ভয় পেয়ে গেল জবা।

কিন্তু লোকটা তার দিকে চেয়েও দেখলে না। লোকটা পাগল। জবা এতক্ষণে বুঝতে পারলে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

কয়েক পা যেতেই ছোট একটি দোকান। বোধ হয় চায়ের। দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করে শোবার উপক্রম করছিল। জবা দোকানের মধ্যে ঢুকে চুপি চুপি একপাশে শুয়ে পড়বে ভাবছিল। কিন্তু লোকটা জবাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো : কে, কে ওখানে? সন্ত্রস্ত জবাকে সেখান থেকে ছুটে পালাতে হোলো।

এবার ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো একটা গাড়ি বারান্দার তলায়। মুটে-মজুর, রিক্সাওয়ালা গোছের কত লোক সেই গাড়ি বারান্দার নিচেই শুয়ে পড়েছে। ছেঁড়া চট, কাঁথা, কম্বল গায়ে দিয়ে। ওদের মধ্যে একটু জায়গা করে নেওয়া যায় কিনা ভাবতে ভাবতে জবার চোখ পড়লো বাড়ির রোয়াকের ওপর। বেশ চওড়া রোয়াক। লোকজন কেউ নেই। রোয়াকের ধারে জানালা, শার্সি-খড়খড়ি বন্ধ। ভেতর থেকে একটু আলো ছিটকে এসে পড়েছে। তা নইলে চারিদিক অন্ধকার। হঠাৎ কারও চোখে পড়বার ভয় নেই। জবা ধীরে ধীরে রোয়াকের উপর উঠে বসলো। ভিতরে কারা যেন কথা বলছে। জবা কান পেতে শুনতে লাগলো। কিন্তু খিদেয়, ঘুমে চোখ তখন জড়িয়ে আসছে। কথাগুলো কানে গেলেও তার মর্ম উপলব্ধি করার মতন শরীর বা মনের অবস্থা জবার নয়।

ভিতরে কথা বলছিলেন রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁর উকীল বন্ধু মহিম

মিত্রের সঙ্গে। বিশ্ববন্ধু ডিটেকৃটিভ এজেন্সীর দুর্গাদাস বটব্যাল আর পার্বতী সান্ন্যালও ছিলেন সেখানে। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় বর্মার বাসিন্দা, ধনী ব্যবসায়ী। কিছু দিন আগে কলকাতায় এসেছেন।

নিজের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ গড়বেন, এই পণ নিয়ে রত্নেশ্বর একদিন দেশের মায়া কাটিয়ে বর্মা মুলুকে গিয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে কি অমানুষিক চেষ্টাই না করতে হয়েতে হয়েছে সেই পণ রাখতে। যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন সেই সময় ভাগ্যলক্ষ্মী হাসিমুখে চাইলেন। তখন লড়াই বেধেছে। বর্মার আকাশে-বাতাসে ছাপা নোট উড়ছে—কখনও ব্রিটিশের, কখনও জাপানের। দুবারই তিনি সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করেছিলেন, ঘুরে বেড়িয়েছিলেন আকিয়াব থেকে মালয়, মৌলমিন থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত। তারপর যখন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাওয়া গেল রত্নেশ্বর সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, জীবনের অনেকগুলো বছর কখন কোথা দিয়ে কেটে গেছে ; টাকা জমেছে প্রচুর, কিন্তু চুলে পাক ধরেছে, উৎসাহ-উদ্দীপনা হঠাৎ যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে এসেছে। জমার ঘরের ফাঁকটা আশাতীত ভাবে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু আর একটা দিক একেবারে ফাঁকা রয়ে গেছে। বিবাহ করেন নি, এমন কি দেশে একখানা চিঠি লিখে নিজের বড় ভাইয়ের খোঁজ নেওয়ারও সময়-সুযোগ করে উঠতে পারেন নি। যুদ্ধ আর টাকা রোজগারের উত্তেজনা যখন কমলো, তখনই মনে পড়লো দাদাকে। চিঠি লিখলেন রত্নেশ্বর পর পর কখানা। একটিরও উত্তর পাওয়া গেল না।

শেষ চেষ্টা হিসেবে রত্নেশ্বর ভারতবর্ষের কয়েকটা ইংরেজী বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, এ্যাডভোকেট বন্ধু মহিম মিত্রকে কলকাতায় চিঠি লিখলেন, বিশ্ববন্ধু ডিটেকৃটিভ এজেন্সীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটালেন মহিমের মারফতে। তাতেও কোন সুরাহা হোলো না। তখন একদিন—অত্যন্ত হঠাৎ প্লেনে চড়ে চলে এলেন কলকাতায়।

ঘরের মধ্যে রত্নেশ্বর বিষণ্ণ, চিন্তাকুল মুখে বসেছিলেন।

মহিম মিত্র বলছিলেন : তুমি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছ রত্নেশ্বর।

বিশ্ববন্ধু ডিটেক্‌টিভ এজেন্সী যখন ভার নিয়েছে তখন কিনারা একটা হবেই—

ডিটেক্‌টিভ এজেন্সীর দুর্গাদাস উৎফুল্ল মুখে বললে : তাঁদের ছেলেমেয়ে কেউ যদি বেঁচে থাকে, তা হলে খুঁজে আমরা বা'র করবোই।

—কবে আর করবেন! বিমর্ষভাবে বললেন রত্নেশ্বর : কাজকর্ম ফেলে বেশী দিন তো আমি এখানে বসে থাকতে পারব না। বর্মায় আমায় দিন কয়েকের মধ্যে ফিরে যেতেই হবে'।

মহিম বললেন : দেখ, চেষ্টার আমরা ত্রুটি করছি না, কিন্তু কোন সূত্র যেখানে নেই—সেখানে—

—সূত্র নেই বলছো কেন? বর্মায় দাদার যে শেষ চিঠি পাই তাতো তোমায় পাঠিয়েছিলাম। তখনই দাদা অত্যন্ত অসুস্থ। তারপর আর কোন খবর না পেয়ে তোমায় খোঁজ করতে লিখি।

—সে চিঠি পেয়ে যা খোঁজ নেবার তা আমি নিয়েছি। তোমায় চিঠি লেখবার মাসখানেক পরে দার্জিলিঙের এক চা-বাগানে তোমার দাদা মারা যান। তারপরেই তোমার বৌদি সেখান থেকে চলে যান। আমি যখন খোঁজ করতে যাই' তখন সে চা-বাগান সম্পূর্ণ হাত বদল হয়ে গেছে। পুরনো লোকজন কেউ নেই। আগেকার কথা সঠিক তাই জানতেই পারলুম না। ·

'কিন্তু, রত্নেশ্বর বললেন, : কিন্তু ছেলে বা মেয়ে দাদার একজন ছিল এটুকুতো জেনেছিলে!

—ওইটুকুই জেনেছিলাম। ছেলে না মেয়ে তাও ঠিক জানতে পারিনি। তোমার বৌদি তাকে নিয়ে কোথায় গেলেন তাও জানা যায় নি।

—ছেলেবেলা থেকেই আমি দেশ ছাড়া! রত্নেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন : বৌদিকে পর্যন্ত নিজের চোখে কখনও দেখিনি। দাদার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গেও তাই কোন পরিচয় আমার নেই! আমার কিন্তু মনে হয়, তাদের কারও খোঁজ পেলে তোমরা সঠিক ব্যাপারটা হয়তো জানতে পারবে!

ডিটেকটিভ এজেন্সীর পার্বতী সান্ন্যাল বললেঃ সে খোঁজও কি আর আমরা করছি না ভেবেছেন। আপনি শুধু একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন—

—তা ছাড়া আর উপায় কি! ম্লান হেসে বললেন রত্নেশ্বর: বিশেষত, আমায় যখন দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। যাই হোক, খবর কিছু পেলে আপনারা সেই খানেই পাঠাবেন।

রাত যথেষ্ট হয়েছিল। রত্নেশ্বর চেয়ার থেকে উঠলেন। দুর্গাদাস আর পার্বতীচরণ নমস্কার করে বিদায় নিল। মহিম মিত্রও প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই উঠে পড়লেন। কথা রইলো কাল আবার আসবেন। চাকর উদ্ধব দরজা বন্ধ করবার জন্য এলো মহিমের পিছনে পিছনে। মহিম যখন বাইরে এলেন জবা তখন রোয়াকের ওপর শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। মহিমের চোখ পড়ে গেল মেয়েটার ওপর। দয়া হল মেয়েটার দুরস্থা দেখে, বললেন: কে এ মেয়েটি?

উদ্ধব এগিয়ে এসে ভাল করে একবার পরখ করলো জবাকে, তারপর বললেঃ মু তো ন জানি বাবু!

হারিয়ে গেছে বোধহয়!

মহিম জবার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কোথা থেকে আসছো খুকি? তোমার বাড়ি কোথায়?

জবা কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছে তার মামাবাড়ির ঠিকানা সে কিছুতেই বলবেনা, তা হলেই তাকে আবার সেই অন্ধকূপে ফিরে যেতে হবে। জবা চুপ করে বসে রইলো।

মহিমবাবুঃ বল, বল, ভয় কি! আমরা তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবো।

জবা কিছু বলবার আগেই ভিতর থেকে রত্নেশ্বরের গলা শোনা গেলঃ ব্যাপার কি মহিমবাবু? কার সঙ্গে কথা কইছেন?

মহিমবাবু বললঃ ছোট একটি মেয়ে, বাইরের দরজার কাছে বসে শীতে কাঁপছে। কোথা থেকে এসেছে, কিছুই বলতে পারছে না।

রত্নেশ্বর ভিতর থেকে বললেনঃ দাঁড়ান আমি যাচ্ছি—

জবা ভাবছিল, হঠাৎ একটা ছুট মেরে এখান থেকে পালালেই বা কি

রকম হয়? ভেবে কিছু ঠিক করবার আগেই কিন্তু রত্নেশ্বর বাইরে এসে পড়লেন।

পার্বতী সান্ন্যাল বললে: দেখুন মজার ব্যাপার। আমরা একজনকে খুঁজে মরছি, আর কোথা থেকে কে এসে হাজির! কিন্তু, একে নিয়ে কি করা যায় বলুন তো? কিছুই তো বলে না।

রত্নেশ্বর হাতের টর্চটা জবার মুখের ওপর ফেলে বললেন: তোমার নাম কি খুকি?

জবা।

বাড়ি কোথায়?

জবা আবার মুখ বুঁজে বসে রইলো। যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

দুর্গাদাস বললে: নাম ছাড়া যে কিছুই বলতে পাবে না! আচ্ছা বিপদে পড়া গেল দেখছি—

রত্নেশ্বর একটু ভাবলেন, তাবপব বললেন: আজ রাতটা তা হলে আমার এখানেই থাক। কাল থানায খবর দিয়ে.কোন খোঁজ পান ভাল, না পান কোন অনাথ আশ্রমে রেখে আসবেন।

পার্বতী আর দুর্গাদাস দুজনেই রত্নেশ্বরের প্রস্তাবে রাজী হযে গেলেন। আপাতত তাদের ঘাড় থেকে একটা বোঝা নামলো, এতেই যেন তারা খুশী। কালকের কথা কাল।

ওরা দুজনেই চলে গেল। রত্নেশ্বর জবাকে ভিতরে নিয়ে এলেন। উদ্ধবকে হুকুম দিলেন মুখ হাত ধুইয়ে ওর খাবার বন্দোবস্ত করতে। খাওয়া-দাওয়া চুকলে বাইরের ঘরেই পুরু একটা কম্বল বিছিয়ে ওর শোবার ব্যবস্থা করলেন। উদ্ধব রইলো পাহারায়। রত্নেশ্বর চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করে উদ্ধব শুয়ে পড়লো বিছানা পেতে। কিন্তু জবার চোখে ঘুম এলো না। শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে লাগলো। আজ সেই রাতটির কথা মনে পড়লে ভাগ্যের বিচিত্র বিধান স্মরণ করে জবা শুধু নীরব একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

সে রাত্রে মুখ ফুটে সে যদি নিজের পরিচয়টা দিত রত্নেশ্বরের কাছে তা হলে তার জীবনের ইতিহাস বুঝি অন্য ভাবে লেখা হ'ত!

সকাল বেলা দুর্গাদাস আর পার্বতী দুজনেই এসে হাজির হোলো। স্বল্পবাক গম্ভীর প্রকৃতি রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ওদের বললেন: আমার যখন থাকার উপায় নেই, এর ভার আপনাদেরই নিতে হবে। থানায় নিয়ে গিয়ে দেখুন, ওঁরা যদি কোন ব্যবস্থা করেন ভাল, নইলে আপনারাই যা হয় বন্দোবস্ত করবেন। খরচপত্রের জন্য কিছু টাকা বরং আপনাদের কাছে রেখে দিন।

রত্নেশ্বর খান কতক নোট এনে ওদের একজনের হাতে দিলেন। ওদের মুখ-চোখ খুশীতে ছেয়ে গেল।

'আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমরা তো আছিই। ব্যবস্থা একটা হবেই।' বলতে বলতে দুর্গাদাস জবাকে একরকম টানতে টানতে সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়লো। চোখে-মুখে খুশী ওদের ধরে না।

পথে এসে ওরা একটা রিক্মায় উঠলো জবাকে নিয়ে।

সেখান থেকে থানায়।

থানায় কিন্তু কোন কিনারা হোলো না। যে মেয়ে তার নাম ছাড়া আর কিছু বলতে রাজী নয়, পুলিশ তার খোঁজ খবরের ভার নিতে রাজী হবে কেন? গত কয়েক দিনের ডায়রী খুলেও তারা এমন কোন মেয়ে হারানোর রিপোর্ট পেলো না যার ওপর নির্ভর করে এই মেয়েটির ভার নেওয়া চলে।

দুর্গাদাস আর পার্বতী থানা থেকে বেরিয়ে এসে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো। জবার জন্যে খানকয়েক বিস্কুট আনিয়ে দিয়ে ওরা চা খেতে খেতে ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন সলাপরামর্শ করতে লাগলো। অনেক্ষণ পরে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে আবার একটা রিক্সা ভাড়া করলো এবং জবাকে নিয়ে এসে হাজির হোলো এই আশ্রমে—যেখানে বসে জবা আজ ভাবছে তার অদ্ভুত অতীতের কথা।

স্পষ্ট মনে আছে সেই প্রথম দিনটির কথা।

অফিসঘরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজমোহনবাবু একজন কেরানীর সাহায্যে হিসেবপত্র পরীক্ষা করছিলেন। নলিনীদি মোটা একটা খাতা নিয়ে কি যেন লিখে রাখছিলেন।

দুর্গাদাস আর পার্বতী জবাকে নিয়ে একেবারে ব্রজমোহনবাবুর কাছে হাজির হোলো। যথোচিত বিনয় এবং ভূমিকার পর জবার ব্যাপারটা তাঁকে খুলে বললো।

আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনে ব্রজমোহন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলোলেন, চোখ বুঁজে কি যেন ভাবলেন, তার পর বললেন : মেয়েটিকে তা হলে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছেন! কিন্তু দেখুন, আমাদের আশ্রমের কয়েকটা নিয়ম আছে আর সেই নিয়মই হোলো এই আশ্রমের প্রাণ! এখানে যাদের নেওয়া হয় তাদের নাম ধাম পরিচয়টা আমাদের জানা দরকার।

বলেন কি মশাই! নাম ধাম পরিচয় থাকলে কেউ অনাথ আশ্রমে আসে! কি বলো হে দুর্গাদাস? পার্বতী সান্ন্যাল কথাটা ব'লে বন্ধুর দিকে চাইলো।

দুর্গাদাস সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে : যা বলেছেন! তা হলে আশ্রমে আসার কি দরকার!

—না, তবু—আত্মীয়স্বজন কোথায় কে আছে একটু খোঁজ রাখা উচিত। ব্রজমোহন যেন একটু ইতস্তত করতে লাগলেন।

পার্বতী বললেন : আত্মীয়স্বজনের খোঁজ পেলে তো সেই খানেই নিয়ে যেতাম। মেয়েটি যে কোন কথাই বলতে চায় না।

—শুধিয়ে শুধিয়ে মুখে ফেনা উঠে গেছে। শুধু নামটুকু ছাড়া আর কিছু বলে না। দুর্গাদাস পাদপূরণ করলে।

ব্রজমোহন আবার যেন ধ্যানস্থ হয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবলেন; তারপর বললেন : হুঁঃ—পুলিশে তা হলে একটু জানিয়ে রাখতে হবে। শেষকালে কার না কার মেয়ে বলে যেন হাঙ্গামায় না পড়তে হয়। পার্বতী ভড়কে যাবার লোক নয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো : হাঙ্গামা কি 'মশাই! তেমন

কোন বড় ঘরের মেয়ে হলে মোটা গোছের পুরস্কার পেয়ে যাবেন। এই মেয়ে থেকেই আপনাদের বরাত খুলে যেতে পারে।

ব্রজমোহনবাবুর প্রসন্ন ভবিষ্যৎ কল্পনা করে পার্বতী সান্ন্যালের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো।

দুর্গাদাস সবিনয় হাসির সঙ্গে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, আমাদের তখন যেন ভুলবেন না স্যার।

এরা রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলেও ব্রজমোহনকে মোটেই উৎফুল্ল হতে দেখা গেল না। মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করেই বললেন : আপনারা ভুল করছেন। পুরস্কার বা কোন রকম লাভের জন্যে এ প্রতিষ্ঠান খোলা হয় নি। আতুর অনাথদের কল্যাণ সাধনই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

বেফাঁস কথাটা সামলাবার জন্যে পার্বতী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো : আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে আসা। আপনাদের মতন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান শহরে আর ক'টা আছে বলুন!

ব্রজমোহনবাবুর গম্ভির মুখমণ্ডলে এবার যেন প্রসন্নতার একটু আমেজ লাগলো। পার্শ্বে উপবিষ্ট কেরানীটিকে তিনি জবার নাম এবং পার্বতী দুর্গাদাসের নাম ঠিকানা খাতায় লিখে নিতে বললেন। নাম লেখার পালা শেষ হলে নলিনীর দিকে চেয়ে বললেন, মেয়েটিকে চারুশীলা দেবীর ক্লাসে দিয়ে এসো তো নলিনী।

নলিনী উঠে জবার কাছে এগিয়ে এলো। সস্নেহে জবার একটি হাত ধরে বললে, এসো ভাই—

কেমন যেন ভয় করছিল জবার। কিন্তু নলিনী-দির মুখের দিকে চেয়ে একটু ভরসাও পাওয়া গেল বুঝি। বুকের মধ্যে ভয়ের কাঁপুনিটা নলিনী-দির হাতের স্পর্শেই যেন থেমে গেল। সাহস করে এগিয়ে চললো জবা নলিনীর পিছনে পিছনে।

অফিসঘর পার হয়ে লম্বা বারান্দা। বারান্দাটা পার হয়ে গেলে ক্লাস। চারিদিক পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বারান্দার পাতাবাহারের টবগুলি পর্যন্ত যেন নিয়মমাফিক, কেতাদুরস্ত ভাবে সাজানো।

জবাকে সঙ্গে নিয়ে নলিনী প্রকাণ্ড একটা ঘরের মধ্যে ঢুকলো। সারি সারি বেঞ্চের উপর বসে ছোট ছোট মেয়েরা তারস্বরে নামতা পড়ে চলেছে। ক্লাস নিচ্ছেন স্বয়ং চারুশীলা দেবী, এই আশ্রমের বালিকাবিভাগের মেট্রণ। চেহারার মতন মুখখানাও ভারী, গোলাকার। চোখে চশমা।

নলিনী তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো: সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই মেয়েটিকে আপনার কাছেই পাঠালেন। আপনার কাছেই বসিয়ে রাখতে বললেন।

চারুশীলা দেবী নলিনীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই জবার দিকে কটমট করে চাইতে লাগলেন। সহজে ভয় পাওয়া জবার অভ্যাস নয়, তবু বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। মামীমাও যেন মাঝে মাঝে ওর দিকে এমনি করে চেয়ে দেখতেন।

মিনিট খানেক জবার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে চারুশীলা দেবী মাত্র একটি কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন: আচ্ছা—

চারুশীলার গলার আওয়াজটাও ওঁর চেহারার মতই ভারী।

ক্লাসে নতুন একটি মেয়ে এলেই আর পাঁচটি মেয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, পড়া বন্ধ করে তার দিকে চেয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু মেট্রন চারুশীলা দেবীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

নলিনী চলে যেতেই তিনি হেঁকে উঠলেন: তোমরা কি দেখচো অমন করে? পড়ায় মন দাও, পড়ায় মন দাও—

মেয়েরা আবার ঐকতান সুরু করলো: সাত ছয়ে বিয়াল্লিশ, সাত সাতে উনপঞ্চাশ—

এবার মেট্রনের চোখ পড়লো জবার দিকে। জবা কি করবে বুঝতে না পেরে তাঁর চেয়ারের কাছটিতে দাঁড়িয়েছিল। চারুশীলা দেবী হঠাৎ একেবারে ফেটে পড়লেন: হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো গে যাও—

এ রকম একটা ধমকের জন্যে তৈরী ছিল না জবা, একটু ঘাবড়ে গিয়ে সামনের বেঞ্চির এক প্রান্তে বসতে গেলো। একটু জায়গা সেখানটায় খালি

ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে চোরা একটা ধাক্কায় তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলো ঃ ঈস্! এখানে আর বসতে হবে না।

অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে জবা এসে বসলো মাঝখানের একটি বেঞ্চে।

ক্লাসের মেয়েরা ইতিমধ্যে আবার নামতা পড়া বন্ধ করে জবার দিকে চাইতে স্বরু করেছে। চারুশীলা দেবী আবার হাঁক দিলেন কই, সব চুপ করে আছ কেন? নামতা পড়, নামতা পড়—

মেয়ের দল আবার স্বরু করলো ঃ ছয়আট্টে আটচল্লিশ, ছয় নয়ে—

ক্লাসের সবাই এক স্বরে চেঁচাতে স্বরু করলো। জবা কি করবে বুঝতে না পেরে মুখ বুঁজে এদিকে ওদিকে চাইতে লাগলো—

হঠাৎ ওর পাশ থেকে একটা মেয়ে নালিশ রুজু করলো ঃ এই মেয়েটা চুপ করে আছে মাসী মা।

কে, চুপ করে আছে কে?

চারুশীলা দেবী রোষ কষায়িত নেত্রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। যে মেয়েটি নালিশ করেছিল সে একটা ধাক্কা মারলে জবার গায়ে। আর একজন বললে ঃ যাও, এগিয়ে যাও, মাসীমা ডাকছেন শুনতে পাচ্ছ না বুঝি—?

জবার ঠিক সামনের বেঞ্চটিতে বসে ছিল ওবই সমবয়সী ফুটফুটে একটি মেয়ে। শোভা। সবাই জবাকে নিয়ে মজা দেখবার উপক্রম করছে, শোভা কিন্তু সহ্য করতে পারলো না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো ঃ ওর দোষ নেই বড় মাসীমা! ওতো এইমাত্র এসেছে!

থাক, তোমাকে আর ওর হয়ে ওকালতি করতে হবে না। মেট্রন চারুলীলা রায় আর একবার গর্জন করে উঠলেন। তারপর জবার দিকে চেয়ে হাঁকলেন ঃ এদিকে এসো—

জবা ইতস্তত করতে লাগলো।

আবার চারুশীলার হাঁক শোনা গেল ঃ এদিকে এসো—

জবা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল তাঁর চেয়ারের কাছে।

চারুশীলা প্রশ্ন করলেন : তোমার নাম কি ?

জবা।

জবা !···বেশ, তুমি নতুন বলে আজ কিছু বললাম না। কিন্তু এখন থেকে এখানকার সব নিয়ম মেনে চলা চাই। এটা শুধু ইস্কুল নয়, আশ্রম। বুঝেছো ?

জবা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লো।

চারুশীলা আবার বললেন : কেবল তোতাপাখির মতন বই পড়লে চলবে না, নিয়ম মেনে চলতে হবে, ডিসিপ্লিন। এই নিয়মই হোল আমাদের আশ্রমের প্রাণ।—যাও, একেবারে শেষের বেঞ্চে গিয়ে বসো গে।

চোখে জল আসছিল জবার। কোন রকমে সে মাথা হেঁট করে পিছনের বেঞ্চে এসে বসলো।

মেয়েরা চুপ করলেই চারুশীলা ভাবেন নিয়ম ভঙ্গ হল। তাই আবাব চিৎকার করে উঠলেন : কই, কই, থামলে কেন তোমরা ? মেয়েরা আবার ছয়ের নামতা নিয়ে গলা ফাটাতে স্বরু করে দিল।

জবাও আস্তে আস্তে স্বর মেলালো ওদের সঙ্গে। কিন্তু মুখ তুলতে পারলো না, ঘাড় হেঁট করে নামতা পড়তে লাগলো।

হঠাৎ ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়লো। ক্লাস শেষ হয়েছে। চারুশীলা ঘব থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাবান্দায তাঁব পায়েব শব্দ মিলোতে না মিলোতে মেয়েরা হুড়মুড় কবে বেবিয়ে পড়লো ঘর থেকে। গেলনা কেবল শোভা। নিজেব জায়গাটিতে বসে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো জবাকে।—সুন্দর মেয়েটি। ভাব করতে পারলে বেশ হয়। কিন্তু মেয়েটি যেন কি! সেই যে ঘাড় হেঁট করে বসেছে, একবার এদিকে মুখ তুলে চাইছে না পর্যন্ত! কি বলে আলাপ করা যায় ঠিক করতে পারলো না শোভা। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এখানকার নিয়ম-কানুন জবা কিছুই জানে না। কেউ তাকে বুঝিয়ে কিছু বলেও নি। সে একা সেই ঘরের মধ্যেই বসে রইলো। একবার

ভাবলো উঠে যায়, কিন্তু তখনই আবার মনে হোলো যদি নিয়ম ভঙ্গ হয়? কেউ তো তাকে ডাকলো না। মেট্রনও কিছু বলে গেলেন না। তবে?

ব্রজমোহনবাবু আর চারুশীলা দুজনে মিলে নিয়ম করেছিলেন, সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত একপ্রস্থ ক্লাস হবে। তারপর মাঝে দুঘণ্টা ছুটি। এই সময়টা সবাই স্নান করবে, খাবে। তারপর বেলা আড়াইটে থেকে আবার ঘণ্টা দুই পড়াশুনো। এতে আর কিছু না হোক, ওঁদের দিবানিদ্রার একটু সুবিধা হয়।

এখন বারোটার ঘণ্টা পড়লো। খাবার ছুটি মেয়েদের। দলে দলে সবাই রান্না-বাড়ির দিকে ছুটে গেল। জবা বসে রইলো তার জায়গাটিতে সেই একভাবে।

দুটো বেজে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল শোভা ঢুকছে ঘরের ভেতর।

শোভা জবার কাছটিতে এসে দাঁড়ালো।

—একি ভাই, তুমি এখনও এখানে বসে আছ?

ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে জবার শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। মুখের ওপর স্পষ্ট যন্ত্রণার ছাপ। কিন্তু এত সহজে ভেঙ্গে পড়বার মেয়ে নয় জবা। তার মনের গোপনে কোথায় যেন আশ্চর্য একটা সাহস, অদ্ভুত একরকম আত্মবিশ্বাস—যাকে বুঝি অহঙ্কারও বলা যায়। তারই জোরে সে সহজে হার স্বীকার করতে পারে না। শোভাকে তার ভালো লেগেছিল। মেট্রনের তিরস্কার থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে শোভার চেষ্টাটুকুও তার চোখ এড়ায় নি। তবু, শোভা যখন এসে প্রশ্ন করলো, জবা তেমনি চুপ করে বসেই রইলো, একটি কথাও বললে না। বলতে পারলো না যে তার খিদে পেয়েছে, ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

কিন্তু মন দিয়ে বুঝি মনকে ছোঁয়া যায়। জবা চুপ করে থাকলেও তার অবস্থাটা বুঝতে শোভার দেরী হোলো না।

—সেই সকাল থেকে না খেয়ে আছ? আচ্ছা, এসো তো আমার সঙ্গে—

যেখানে কোন প্রত্যাশা নেই, সেখানে হঠাৎ সহানুভূতির পরিচয় পেলে

জবার মতো মেয়ের চোখেও জল আসে। শোভার কথা শুনে জবা ঠোঁট দুটো শক্ত করে চেপে শুধু বার বার ঘাড় নাড়তে লাগলো।

শোভা যেন এই কিছুক্ষণের মধ্যেই জবাকে বুঝে ফেলেছে। একটু চুপ করে থেকে বললেঃ আচ্ছা তোমার আসতে হবে না, আমি দেখছি—

বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই চারুশীলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

শোভা বললে: বড় মাসীমা, যে মেয়েটি আজ নতুন এসেছে তার এখনও খাওয়া হয়নি।

চারুশীলা আহারাদি সেরে নিয়মমতো একটু বিশ্রাম করতে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতেই মুখখানা ভারী করে জবাব দিলেনঃ হয়নি তো আমি কী করবো? খেতে যায়নি কেন?

—কি করে যাবে? সবে আজ নতুন এসেছে। সে কি কিছু জানে।

তোমরা তো ছিলে। সঙ্গে করে ওকে খেতে নিয়ে যাওনি কেন? কতবার তোমাদের বলেছি, আশ্রমের নিয়মগুলো ঠিক মতো—

বলতে বলতেই তিনি কর্তব্য সম্পাদনের পরিতৃপ্তি মুখে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। আর ক'মিনিট পরেই আবার ক্লাস। এখন নষ্ট করবার মতো সময় নেই। একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার।

শোভা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে লাগলো। যেন নতুন মেয়েটিকে এখানকার নিয়ম-কানুনগুলো বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব শুধু মেয়েদেরই! ওঁর নিজের কিছুই করবার নেই।

কিন্তু দাঁড়িয়ে ভাবলে হবে না। জবার জন্যে খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। নইলে সারাদিন বেচারীর খাওয়াই হবে না।

শোভা ছুটলো রান্না-বাড়ির দিকে।

রসুই ঘরে জগন্নাথ চক্রবর্তী ওরফে জগা খাওয়া-দাওয়া এবং হাঁড়ি-কুড়ির পাট চুকিয়ে লম্বা একটা ঘুম দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। শোভা এসে

বললো : তোমার কাছে খাবার-দাবার কিছু আছে ? একটি মেয়ে সারাদিন কিছু খায় নি।

ঘুমে জবার শরীর ভারী হয়ে আসছিল, প্রায় ঢুলতে ঢুলতে জবাব দিলে : কেন, রাগ হয়েছে বুঝি ? তা, রাগ করে অমন উপোস করা ভালো।

—যা তা বলো না। রাগ করবে কেন ? নতুন মেয়ে, কিছু জানে না। কেউ তাকে ডাকে নি। দাও না যদি কিছু থাকে।

—হুঁঃ, তুমি মিষ্টি করে বললে দাও না, আর আমি অমনি দিয়ে দিলাম ! ...না, না, এখানে কিছু নেই।

তাকের ওপর গোটা কতক ডিম, আলু, পেঁয়াজ...আরও কি কি যেন রাখা ছিল। সে দিকে চাইতে চাইতে শোভা বললো : ওই তো তাকের ওপর কি সব রয়েছে।

—আছে তো হয়েছে কি ! ওসব তোমাদের জন্যে নয়। যাও দিকি, এখন আমার বিশ্রামের টাইম, বিরক্ত করো না।

ক্ষুণ্ণ মনে শোভা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

উঠোনটা পার হতেই সাধনের সঙ্গে দেখা। সাধন এখানকার বয়, বেয়ারা, চাপরাসী—একাধারে সব।

—ও সাধন-দা, কোথায় যাচ্ছ ? বলতে বলতে শোভা তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কোথায় যে যাচ্ছি, তা কি জানি দিদিমণি ! সাধন জবাব দেয় : ভব নদীতে শুধু ভেসেই চলেছি।

—পাগলামি ছাড়ো। তোমায় একটি কাজ করতে হবে।

—কি কাজ দিদিমণি ?

—জবা বলে আজ একটি নতুন মেয়ে এসেছে। সকাল থেকে তার খাওয়া হয় নি। কেউ তাকে ডাকে নি।

—তাই তো দিদিমণি ! বড় ভাবনায় ফেল্লে। আমি অফিসের বেয়ারা, শুধু বই খাতা বয়ে বেড়াই। ওসব খাবার-দাবারের ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই ! তুমি বরং একবার রান্নাঘরে যাও না।

—সেখানে তো গিয়েছিলাম। জগাটা কি রকম পাজী জানো তো। বললে, কিছু নেই।

সাধন কি যেন একটু ভাবলো। তারপর বললে: চলো তো দেখি—

রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে সাধন বললে: কইরে জগা, করছিস কি? আজ মাছের তরকারিটা যা রেঁধেছিলি—ফাস্টো কেলাস! খোশবাই যা ছেড়েছিলো! তা জগা আমাদের রাঁধে ভালো, বুঝলে দিদিমণি?

সাধনের পিছনে শোভাকে দেখেই জগন্নাথ একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলো, বললে: কি মতলবটা বলো তো? এখানে চালাকী-টালাকী চলবে না, তা কিন্তু বলে রাখছি।

—রামঃ বল! তোর সঙ্গে চালাকী করবো আমি? তা খাবার-দাবার কিছু থাকে তো দেনা। একটা মেয়ে সারাদিন না খেয়ে রয়েছে।

—না খেয়ে রয়েছে তো আমি কি করবো! এই অবেলায় আমি খাবার পাব কোথায়?

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে সাধন তাকের ওপর হাত বাড়াতেই জগন্নাথ একেবারে চিৎকার করে উঠলো: ওখানে হাত দিও না বলছি। আটটা ডিম আর দশখানা রুটি আমার গোণা আছে!

—গোণা আছে বুঝি! তা গোণা যখন আছে তখন আর ভাবনা কি! —সাধন এবার শোভার দিকে ফিরে বিমর্ষ মুখে বললে: না, দিদিমণি জগার কাছে কিছু পাওয়া যাবে না!

—তা হলে কি হবে সাধন-দা? মেয়েটি সারাদিন না খেয়ে থাকবে? বলতে বলতে শোভার চোখে জল এসে পড়লো। মুস্কিলে পড়ে গেল সাধন। ছোট ছেলে মেয়ের চোখের জল আর সময় মতো না খেতে পাওয়া, এ দুটো জিনিস কিছুতেই তার সহ্য হয় না। একটু চুপ করে কি ভাবলো, তারপর বললে: দেখি, ম্যাজিকে যদি কিছু করতে পারি!

—ম্যাজিকে খাবার তৈরি করবে? শোভার কৌতূহলী প্রশ্ন।

—ম্যাজিকে খাবার তৈরী করবে কি রকম? জগন্নাথের সংশয়াচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা।

দেখি কি রকম হয়, বলতে বলতে সাধন উনুনের দিকে এগিয়ে গেল। উনুনের ওপর প্রকাণ্ড এনামেলের ডেকচিতে কি ফুটছিল। সাধন বললে : ওটা কি চাপিয়েছিস রে জগা ?

—ও বেলার ডাল। সেদ্ধ করে রাখছি।

—তা বেশ করেছিস। একবার ডেকচিটা নামা দেখি—

—কেন বলতো ?

—একটা বিড়ি ধরাব। দিয়াশলাইটা খুঁজে পাচ্ছি না।

জগন্নাথ ডেকচিটা নামালো মুখভার করে। যত ঝামেলা তার এই বিশ্রামের সময়। সাধন ইতিমধ্যে তাক থেকে একটা ফ্রাইং প্যান পেড়ে নিয়েছিল। সেটা উনুনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বললে : একটা প্লেট ধরো তো দিদিমণি—

জবা তাক্ থেকে একটা প্লেট পেড়ে তার সামনে ধরলো।

ভারি বেয়াড়া লোক এই সাধন। কখন কি যে করে তার কোন ঠিক নেই। জগন্নাথ অবাক হয়ে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো। বিড়ি ধরাবে তো প্যান কি দরকার ?

সাধন প্যানটায় একটু ঘি ছড়িয়ে দিয়ে চকিতের মধ্যে দু হাত থেকে দুটি ডিম বার করলো। তারপর ডিম দুটিকে ভেঙ্গে প্যানে ছেড়ে দিলে। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড একটা ডিমের বড়া তৈরী হয়ে গেল।

জগন্নাথ আর শোভা দুজনেই সবিস্ময়ে দেখছিল। কাউকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সাধন প্যান থেকে ডিমের বড়াটা তুলে শোভার হাতের প্লেটে রাখলো। তারপর নিজের পকেটে হাত চালিয়ে দু'পিস পাঁউরুটি বের করে ফেললো। সেদুটি প্লেটের উপর রাখতে রাখতে বললো : দেখ্‌লে ! একেই বলে ম্যাজিক—যার নাম ফুসমন্তর ! ভোজবাজী !

জগা যেন বোকা বনে গিয়েছিল। চোখ দুটো বড় বড় করে বললে : অ্যাঁ ! সত্যিকারের খাবার ? খাওয়া যায় ?

সাধন বললে : তা যায় বই কি। খেয়ে দেখবি নাকি ? চল দিদিমণি, তোমার নতুন বন্ধুটিকে খাইয়ে পরীক্ষে করে আসি।

শোভাকে সঙ্গে নিয়ে সাধন চলে গেল।

জগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো সাধন হঠাৎ ডিম আর রুটি বের করলো কি করে? লোকটি কি সত্যিই ম্যাজিক জানে নাকি?

তাকের তলায় জগন্নাথের বালিশ-বিছানা মাদুরে জড়ানো থাকে। শোবার উদ্যোগ করবার জন্যে সেগুলো বের করতে যেতেই চোখ পড়লো উপরের তাকে। দুটো ডিম আর দু পিস পাঁউরুটি কম।

জগন্নাথ এতক্ষণে সাধনের ফুসমন্তরের মানে বুঝতে পারলো।

শোভার সঙ্গে সঙ্গে সাধনও এলো জবার কাছে। জবা তখনও একা সেই বেঞ্চটির উপর বসে আছে।

খাবারের প্লেটটা জবার সামনে রেখে শোভা বলেঃ এই নাও ভাই, খেয়ে নাও।

জবা প্লেটটার দিকে চাইলো। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তখন কান্নায় ঝাপসা হয়ে গেছে।

—না, না···আমি খাব না।

—লক্ষ্মী ভাই, রাগ কোরো না। খেয়ে নাও।

—রাগ করে কি হবে দিদিমণি? এবার সাধন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেঃ এখানে চারধারে পাথরের দেয়াল। রাগ করে মাথা খুঁড়লে শুধু নিজের মাথা ফুলে ঢিবি হবে। তার চেয়ে যখন যেটুকু পাওয়া যায় খেয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বুঝলে?

জবা উত্তর দেবার আগেই সাধন গান ধরে দেয়—

> তেমন বোকা নইকো আমি
> রাগ করে হব উপুষী,
> যেমন জোটে তাই খেয়ে মা,
> থাকি আমি সদাই খুশী।

সাধন এমন হাত-পা নেড়ে রামপ্রসাদী সুরে গাইতে লাগলো যে জবা না হেসে পারলো না। দেখতে দেখতে কখন এক সময় ডিমের একটা টুকরো ভেঙ্গে মুখে ফেললো, নিজেই খেয়াল করতে পারলো না।

এমনি করে সুরু হয়েছিল জবার এখানকার জীবন। শোভা আর সাধন-দা না থাকলে একটি দিনও সে বুঝি এখানে টিঁকতে পারতো না। সেই প্রথম দিনটিতেই এরা দুজন তাকে যেন একেবারে নিজের করে নিয়েছিলো।

ধীরে ধীরে জবা এখানকার আবহাওয়া, নিয়ম-কানুন, সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে লাগলো।

সে দিন সকালে সবাই মিলে উঠোনের মাঝখানে খেলা করছে, সাধন-দা এসে তাড়া লাগালো: আরে, তোমরা এখনও খেলা করছো দিদিরা! ওদিকে যে এখুনি ঘণ্টা পড়বে—

—তা পড়ুক,—রেণু না কে বলে উঠলো: রোজ তুমি ফাঁকি দাও, আজ তোমাকে ম্যাজিক দেখাতেই হবে।

—ম্যাজিক দেখাতে হবে! বল কি গো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ওই ভোজবাজী। জবা বলে উঠলো: তুমি বলছিলে না ভোজবাজী জান?

—তা একটু আধটু জানি বৈকি দিদি। এই দুনিয়াটাই এমন ভোজবাজী যে দুচারটে প্যাঁচ না শিখে উপায় নেই!

ওই সুরু হোলো সাধনদার পাগলামি! শোভা ফোঁস করে উঠলো: না, আজ আর কথায় হবে না। দেখাতেই হবে।

—বেশ, তবে ছাখ।

সাধন উঠোনের মাঝখানেই বসে পড়লো। কাঁধ থেকে গামছাটা নামিয়ে বললে: এই যে দেখছ গামছাটি, কিছু নেইতো?

গামছাটি নেড়েচেড়ে সে পায়ের ওপর ঢাকা দিল। তারপর বললে: এই ছাখ, এমনি করে ঢাকা দিলাম। এইবার তোলো তো!

রেণু গামছাটা তুলতেই সাধনের কোলের ওপর দেখা গেল কাগজের একটা ঠোঙা। ঠোঙাটা খুলতেই দেখা গেল, এক রাশ লজেঞ্চ।

রেণু সবিস্ময়ে হাততালি দিয়ে উঠলো: ওমা! লজেঞ্চ!

সাধন বললে : লজেঞ্চুস নাকি! দেখি, দেখি! হুঁ, তাই তো! তা হলে ভাগ করে সবাই খেয়ে ফেলো।

মেয়ের দল কাগজের ঠোঙাটার ওপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আর সাধন হাসিমাখা মুখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো তাদের কড়াকাড়ি!

মেয়েগুলিকে এমনি ছোট খাট আনন্দের খোরাক সাধনকে প্রায়ই জোগাতে হয়। আর সাধনের আনন্দও বুঝি এরই সঙ্গে কখন যেন এক হয়ে গেছে।

—বলি কি হচ্ছে এখানে? ওদিকে ম্যানেজার বাবু কখন থেকে তোমায় খুঁজছেন, খেয়াল আছে? সাধনকে ধমক দিতে এসে জগন্নাথের চোখ পড়লো মেয়েদের হাতে মুঠো মুঠো লজেঞ্চগুলোর ওপর :

—ওকি! এত লজেঞ্চুস কোথা থেকে এলো?

উত্তর দিলে জবা : সাধন-দা ম্যাজিকে তৈরী করলে যে!

—ম্যাজিক করে তৈরা করলে! ম্যাজিকে লজেঞ্চুস হয় নাকি?

জগার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো।

—হবে না কেন! করতে জানলে সব হয়! মুরুব্বি-চালে জবাব দিলে সাধন।

জগা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলে না। অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে : হুঁঃ, সব হয়! আচ্ছা, ম্যাজিকে আমায় একটা টাকার তোড়া এনে দিতে পার? বেশ খাঁটি টাকা!

—ঝকঝকে খাঁটি টাকা? হুঁ —সাধন বললে : কিন্তু একটা আসল টাকা তা হলে দরকার।

—টাকা! টাকা তো নেই! জগা এ-পকেট, ও-পকেট হাতড়ে একটা সিকি বার করলে শেষ পর্যন্ত।

—সিকি! সাধন তাতেও পেছপাও হবার লোক নয়। রীতিমত গম্ভীর মুখে বললে : আচ্ছা, দেখি সিকি দিয়ে কি করতে পারি। বলেই জগার হাত থেকে সিকিটা নিয়ে সে গামছা চাপা দিল। তারপর মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললে : আচ্ছা, এইবার দেখ তো তুলে।

জগা হাসিমুখে তাড়াতাড়ি গামছাটা তুলতেই বেরিয়ে এল একটি পাকা কলা।

ছেলেরা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো : ওমা, কি মজা ! কলা !

জগার মুখের হাসি ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে। বিরক্তভাবে বললে : অ্যাঁ ! টাকার তোড়ার বদলে আমার সিকি কলা হয়ে গেল।

—তাই তো দেখছি ! সাধন তেমনি গম্ভীর মুখে বলে : সিকিটা তোমার রোজগারের নয় বোধ হয়। নিশ্চয় বাজার করতে গিয়ে চুরি করেছো !

—চুরি করেছি ! জগা একেবারে ক্ষেপে উঠলো : ভাল হবে না বলছি সাধন, ভাল হবে না। শিগগির আমাব সিকি বের করে দাও বলছি—

আমি কি করবো ভাই ! অধর্মের কড়ি শেষ পর্যন্ত কলাই হয়ে দাঁড়ায়। সাধন হাসতে হাসত বলে : এক কাজ কর। লোকসান যখন হয়েছে, কলাটা খেয়েই ফেল।

চার আনা পয়সা, একদিনের আফিমের খরচ। জগা সত্যি রেগেছিল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো : আমায় কলা খাওয়াচ্ছ ! ……রেখে দাও ওসব চালাকী। বের কর আমার সিকি।

—আরে, কি বিপদ ! সিকি কোথায় পাব। এই দেখ আমার জামা-কাপড় খুঁজে ! কোথাও কি কিছু আছে ?

—না থাকে, ঘর থেকে দেবে চলো।

—এই গ্যাখ ! ঘরই কি আমার আছে কোথাও।

—তোমার ঘর নেই সাধন-দা ? এবার প্রশ্নটা কৌতূহলী শোভার।

—ঘর কি আর নেই—তবে সে বড় মজার ঘর।

—সেই মজার ঘরেই চলো তা হলে। জগা সাধনের হাত চেপে ধরলো।

হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে সাধন বললে : আরে, ঘরের খবরটাই আগে শোন—

বলতে বলতে সাধন একেবারে গান সুরু করে দেয়—

আমার ঘরের খবর শোন,
শোন শোন ভাই,
তার জানলা কপাট চুরি গেছে
দেওয়াল কোথাও নাই।
ভিত গাঁথা তার অথৈ জলে
ঢেউয়ের মাথায় কেবল দোলে
ও তার ঠিকানা যে কোথায়
তা ঠিক বলতে নারি ভাই।
ওরে আজব কথা, ঘরের মালিক
আপন ঘরে পর।
তার ঘর চিনিতে যায় যে কেটে
কতই যুগান্তর।
(ওরে) বারেক এঘর চিনলে পরে
সকল ধাঁধা যায় যে সরে
(ও তার) বিনা তেলের বাতি তখন
অন্তরে রোশনাই।

গান গাইতে সুরু করলে সাধন যেন একেবারে তার মধ্যে ডুবে যায়। কোন কিছু আর খেয়াল থাকে না। মেয়ের দলও লেখাপড়ার কথা ভুলে তার গান শোনে। এখানকার ছকে ফেলা ধরা-বাঁধা নিয়ম-মাফিক জীবন-যাত্রার মাঝখানে সাধনদাই তাদের ছুটির বাঁশী। আজও তার ব্যতিক্রম হোলো না। সবাই একমনে গান শুনতে লাগলো। মায় জগা পর্যন্ত। আর তারই ফাঁকে ব্রজমোহন কখন সেখানে এসে পৌছলেন সে দিকে কারও খেয়ালই রইলো না।

চমক ভাঙলো তাঁর গুরু-গম্ভীর গলার আওয়াজে।

—কতবার তোমায় বলেছি সাধন, এই সব সুকুমারমতি বালিকাদের কাছে ওসব অসভ্য, অভদ্র গান গাইবে না।

ভড়কাবার লোক নয় সাধন। বয়েস হয়েছে, সংসারে পিছু টান বলতে কেউ নেই। ব্রজমোহনবাবুর মুখের ওপরেই বললে: আজ্ঞে, অসভ্য, অভদ্দর গান হবে কেন! এ তো সাধনতত্ত্বের গান। ধর্মের গান।

—না, না, ওসব অসভ্য, অভদ্র, কুশিক্ষামূলক ধর্মটর্ম এখানে চলবে না। —জজের মত গম্ভীর মুখে রায় দিলেন ব্রজমোহন: এরকম করলে আশ্রমের নিয়ম-শৃঙ্খলা কিছু আর থাকবে না। মেয়েদের ক্লাসে যেতে বলো।

ব্রজমোহন অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। মেয়েরাও পালালো।

এমনি করেই কেটেছিল প্রথম দিনগুলো, জবার বেশ মনে আছে!

ব্রজমোহন আর চারুশীলা, যেন মানুষের পোশাক-পরা দম-দেওয়া দুটো যন্ত্র। নিয়ম ছাড়া কিছু বোঝে না। একদল অনাথা মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু দুবেলা দুমুঠো খাওয়া আর বইয়ের পড়া মুখস্ত করা ছাড়াও যে জীবনে তাদের উপভোগ করবার কিছু থাকতে পারে, একথা যেন ওদের মনেই নেই। কিংবা মনে করতে চায় না।

এমন আবহাওয়ার মধ্যে জবার মতো মেয়ের দম বন্ধ হয়ে যাবারই কথা। শাসনের যে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে মামীমার আশ্রয় ছেড়ে পালিয়েছে, এখানেও তো তারি শুধু রকম ফের। জবা হয়তো সত্যি একদিন পালাতো এখান থেকেও। কিন্তু নলিনী-দি, কি জানি কী মনে করে দিন কয়েক পরে ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন শোভার ঘরে। তিনি নিজেও থাকতেন সেই ঘরেই। শোভা মেয়েটির শরীর তেমন ভালো নয়। মাঝে মাঝে জ্বর হয়। নলিনী-দি ওকে চোখে চোখে রাখবার জন্যে নিজের ঘরেই জায়গা দিয়েছিলেন। জবাও সেখানে জায়গা পেয়ে যেন বেঁচে গেল। এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, পড়া-শুনো, শোয়া-বসা, মাসখানেক যেতে না যেতে অবস্থা এমনি দাঁড়াল যে কেউ আর কাউকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না।

আশ্রমের পিছন দিকটায় ছোট একটি বাগান। বিকেল বেলাটা দুজনে এখানেই কাটায়। আর সব মেয়েরা যখন ছুটোছুটি করে—ব্রজমোহন আর

চারুশীলার দৃষ্টি এড়িয়ে, ওরা ছুটিতে বসে বসে করে গল্প। সে গল্প যেন আর শেষ হতে চায় না। হয় বাগানে, নয় তো নাটমন্দিরে ওদের খুঁজে পাওয়া যাবেই। নাটমন্দিরটিও খুব নিরিবিলি। কেউ বড় একটা আসে না এদিকে।

শোভা বলেঃ এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে। তুমি যখন আসনি, তখন কতদিন একলা এখানে এসে বসে থাকতাম।

—ভয় করে না? জবা জিজ্ঞাসা করে।

—উঁহু, আমার তো ভয় নেই।

—ভয় নেই! আমার কিন্তু ভাই ভয় করে। মামীমা যখন চোর-কুঠুরিতে বন্ধ করে রেখেছিল আমার এমন ভয় করছিল! রাস্তায় পালিয়ে গিয়েও অত ভয় করেনি। রাস্তায় তবু তো মানুষ আছে। অন্ধকাব ঘরে বুকটা যেন হিম হয়ে যায়।

—আমার কিছু ভয় করে না। মরে যাবো বলেই তো ভয়! আমার সে ভয় একটুও নেই। আমি তো জানি, শিগগিরই মরে যাব।

—যাঃ! ওকথা বলতে নেই।

—কেন বলতে নেই? যা সত্যি জানি বলতে দোষ কি!

—সত্যি আবার কেউ আগে থাকতে জানে নাকি! মরার কথা কেউ বলতে পারে?

—হ্যাঁ, আমি পারি। আমাদের বাড়ির কেউ বেশী দিন বাঁচে না! আমার মা, বাবা, দিদি, কেউ বেশী দিন বাঁচেনি! মরতে তাই আমার একটুও ভয় করে না। শুধু আজকাল তোমার জন্যে একটু কষ্ট হয়।

লজ্জিতভাবে ক্ষীণ একটু হাসলো শোভা। জবা তাড়াতাড়ি ওর হাতে মুখ চাপা দিয়ে বলেঃ ও কথা বোলো না, আমার কান্না পায়। তুমি ছাড়া আমার কেউ ভালবাসার নেই, তুমি আর চপলাদি—

—চপলাদি আবার কে?

—আমার মামার বাড়ির ঝি—খুব ভালো।

চপলাদির প্রশংসায় খুশী হতে পারলো না শোভা। অভিমানে মুখখানা

দেখতে দেখতে ভারী হয়ে উঠলো। জবার কাছ থেকে একটু সরে বসে বললে : বেশ, তোমার চপলাদিই ভালো।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়লো সঙ্গে সঙ্গে।

জবা বললে : না গো না ; তুমি তার চেয়েও ভালো।

—সত্যি ? খুশীতে জ্বলে উঠলো শোভা সঙ্গে সঙ্গে।

—সত্যি।

শোভা উঠে দাঁড়ালো। দুর্বল শরীরটি আনন্দে থর থর করে কাঁপছে।

—আয় আমরা বন্ধুত্ব পাতাই। এমন বন্ধুত্ব যে মরে গেলেও যাবে না।

মরে গেলেও নষ্ট হয় না সে আবার কেমন বন্ধুত্ব ? রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লো জবা। ভাবতে ভাবতেই বললো : কি করে পাতাবো ?

এসব বিষয়ে জবার চেয়ে শোভার কল্পনা অনেক বেশী। বেশী বয়সের মেয়ের মতো সে যেন অনেক বেশী ভাবতে পারে, দেখতে পায় জীবনের অনেক দূর পর্যন্ত। চোখের দৃষ্টিটা রোগে ক্ষীণ, মনের দৃষ্টিটা তাই বুঝি এত প্রখর। একটু চুপ করে থেকেই বলে : দাঁড়া, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়, এখুনি সব ঠিক করে ফেলছি।

সাধন যাচ্ছিল ওধার দিয়ে। শোভা তাকে ডাকাডাকি সুরু করে দিল। সাধন কাছে আসতেই বললে : তোমার কাছে ছুরি আছে ?

—ছুরি ? ছুরি কোথায় পাব দিদি ! ছুরি থাকলে ভবের বাঁধন কেটে কবে বেরিয়ে যেতাম।

যাও, তোমার ও সব কথা কিছু বুঝি না। দাও না যদি থাকে। তোমার কাছে তো ছুরি থাকে। তুমি তো ম্যাজিকে সব পারো।

—সব পারলে আর ভাবনা ছিল কি দিদি ! তা হলে তোমাদের দুটিকে এখান থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোথাও কোন রাজবাড়ির রূপোর খাটে বসিয়ে রাখতাম।......তা যখন পারছি না, তখন ছুরিটা দিয়েই একটু উপকার করে দেখি।

ফতুয়ার পকেট থেকে ছুরিটা বের করে সাধন বলে : কিন্তু কি করবে বলো দেখি ? কাঁচা পেয়ারা-টেয়ারা কোথাও থেকে জোগাড় করো নি

তো? মেট্রন ঠাকরুণ দেখতে পেলে পুরো একটি ঘণ্টা লেকচার দেবে কিন্তু—

—দেখ না কি কখি। আয় জবা—

শোভা জবাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললো বাগানের দিকে। সাধনও চললো তাদের সঙ্গে।

বাগানে এসে মস্ত একটা গাছের তলায় থামলো শোভা। তারপর ছুরিটা খুলে গাছের গায়ে নিজের নাম লিখতে লাগলো বড় বড় করে।

জবা জিজ্ঞাসা করলে ঃ এ আবার কি ভাই?

—আমার নাম লিখে রাখলাম। এবার তোমার নামটা লিখে ফেল।

শোভা ছুরিটা দিল জবার হাতে। কিন্তু জবা লিখতে সুরু করবাব আগেই সাধন বলে উঠলো ঃ এই রে! জগাটা এই দিকেই আসছে!

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল মেয়ে দুটির।

জগন্নাথ দূর থেকেই হাঁক পাড়লো ঃ কেরে ওখানে? বলি বাগানে ঢুকে হচ্ছে কি?

—কি হবে সাধন-দা! জগা যে বড় মাসিমার কাছে নালিশ করবে!

মেয়েদের বিপদের বন্ধু সাধন, সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিলে ঃ হুঁঃ, নালিশ করলেই হোলো! আসুক না এদিকে। নতুন একটা ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়বো—

জগন্নাথ খানিকটা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, এখানে কি হচ্ছে বলো তো?

সাধনের মতলব ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গেছে। সে হঠাৎ একবার পকেটে, একবার ট্যাকে হাত দিয়ে, এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বলে উঠলো—কোথায় যে পড়লো!

কি পড়লো? জগার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠলো। সাধন মাটির দিকে চেয়ে বললে, টাকা। একটা টাকা, এই মাত্র—

জগাও সঙ্গে সঙ্গে খুঁজতে লাগলো এদিক ওদিক চারদিক। সাধন যেন নিজের মনেই বলতে লাগলো, ওই দিক দিয়ে আসছিলাম হঠাৎ—

বলে সে গাছতলার উল্টোদিকের একটা জায়গার দিকে চাইতে লাগলো।

—কোন্ দিকটায় পড়লো? জগা জিজ্ঞাসা করলে।

সাধন গাছতলার উল্টোদিকের সেই জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

—দেখ দেখি, ওই দিকটায় বোধ হয়।

বলে এগিয়ে যেতে লাগলো সাধন। জগন্নাথ তার পিছু পিছু ছুটলো। টাকাটা খুঁজে বার করতে পারলে সাধনের কাছ থেকে আজকের আফিমের খরচ বাবদ যদি কিছু আদায় করা যায়।

কিন্তু সাধনের মতলব আর একরকম। যেতে যেতেই সে হাত নেড়ে ইসারা করে শোভা আর জবাকে ওদের কাজ তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে বলে। আহা, ছোট দুটি মেয়ে! সখ হয়েছে গাছে নাম লিখে রাখবে। লিখুক।

সাধন যেন টাকার খোঁজে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে অনেক দূর এগিয়ে গেল, সঙ্গে জগন্নাথ। আর সেই ফাঁকে শোভা তাড়াতাড়ি ছুরির ফলা দিয়ে নিজের নামের হরফগুলো গাছেব গায়ে খোদাই করে ফেলে জবাকে বললে: নে ভাই, আমার লেখা হয়ে গেছে, এবার তোর নামটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেল্।

শোভার কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে জবা নিজের নাম খোদাই করতে লাগলো—

ওদিকে জগন্নাথ তখন সাধনকে বলছে, ভাল করে পকেটটা দেখেছিস? ঠিক পড়েছে জানিস তো?

আমার টাকা আর আমি জানি না! পকেট থেকে ধপ্ করে পড়লো!

—ধপ্ করে পড়লো কি রে? টাকা কখনও ধপ করে পড়ে?

—পড়ে রে, পড়ে। কখনও ঠক্ করে পড়ে, কখনও ধপ্ করে পড়ে। কখনও এমন চুপি চুপি পড়ে যে টেরও পাওয়া যায় না।

কথা কইতে কইতে সাধন জগাকে একেবারে আড়ালে টেনে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে জবার নাম লেখা শেষ হয়েছে। গাছের গায়ে ফুটে উঠেছে বড় বড়, আঁকা-বাঁকা চারটি হরফ: শোভা আর জবা। দুই বন্ধুতে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সেই দিকে চেয়ে রইলো কতক্ষণ।

শোভার আনন্দই বেশী।

এই যেমন আমাদের নাম তেমনি আমাদের বন্ধুত্বও কোনদিন মুছে যাবে না, কি বল্ ভাই?

—কখ্খনো না।

দু'জনে অপলক চোখে চেয়ে থাকে সেই চারটি অক্ষরের দিকে। মাথার ওপর গাছপালার মৃদু মর্মর, স্নিগ্ধ ছায়া, ঝিরঝিরে বাতাস এই দুটি প্রীতি-মুগ্ধ মনকে যেন আশীর্বাদ করে যায়।

দিন কাটে। দিনের পর দিন, মাস, বছর—

বছরের পর বছর কাটে এই আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে। পরস্পরকে ওরা আরও বেশী করে চেনে, জানে, ভালবাসে।

কৈশোরের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পা দেয় প্রথম যৌবনে।

আশ্চর্য সেই দিনগুলি। সেই ধরা-বাঁধা গণ্ডীর মধ্যেই এমন অদ্ভুত ভাল লাগতো। মনে হোতো, এর সব কিছুই নতুন, সব কিছুই ভালো, সব কিছুই সুন্দর।

শুধু শোভার শরীর নিয়েই যা ভাবনা।

মাঝে মাঝে জ্বর লেগেই আছে—বিশেষ করে বিকেলের দিকে। চোখের কোলে কালি পড়েছে এই বয়সে, সন্ধ্যের পর চোখ-দুটো যেন জ্বালা করে ভারী হয়ে আসে। খাওয়ায় রুচি নেই মোটে। বড়মাসিমা—মেট্রন চারুশীলা রায় এসব খোঁজ-খবর রাখেন না বললেই হয়। সব ভাবনা নলিনী-দির। তিনিই বলে কয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনে দেখালেন। অজয় ডাক্তার মুখে কিছু বললো না, কিন্তু সেইদিন থেকেই আলাদা ঘরে শোভার শোবার ব্যবস্থা হয়ে গেল! এক্সরে প্লেট নেওয়া হোলো। ওষুধপত্র, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম···সব কিছুরই ব্যবস্থা হোলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

একা একা ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতেই বা কতক্ষণ ভাল লাগে! শোভা যেন হাঁফিয়ে ওঠে। চারুশীলা ওর জন্যে একেবারে বাড়ির শেষ প্রান্তের ঘরটি ঠিক করে দিয়েছেন। সেদিকে বড় একটা কেউ যায় না। নলিনীদিই

সময় পেলে এসে একটু বসেন, আর জবা। তাও চারুশীলার চোখে পড়লে জবার ধমক খাওয়ার ভয় আছে। জবাকেও লুকিয়ে চুরিয়ে যেতে হয়।

সেদিন শোভার ঘরে গিয়ে জবা তাকে দেখতে পেলো না। ঠিক এই সময়টা শোভার জ্বর আসে। গেল কোথায় রোগা শরীর নিয়ে?

বাগানে মেয়েরা দল বেঁধে খেলছে।

—এই শোভাকে দেখেছিস কেউ? ছুটতে ছুটত এসে প্রশ্ন করলো জবা।

—বাবা! রাতদিন খালি শোভা আর শোভা! রেণু ঠাট্টা সুরু করলো: এক পলক না দেখলে একেবারে অন্ধকার!

—একেবারে এক বৃন্তে দুটি ফুল—মানিকজোড়!

আর একজন ফোড়ন দিলে।

অপর একটি মেয়ে গাছতলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে: ওই তোমার শোভা গো! ওই গাছতলায়—

সেই গাছতলা—যার গায়ে ওরা দু'জনে একদিন নাম লিখেছিল! শোভা ওরি নীচে চুপ করে বসে আছে।

কি ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে বিকেল বেলার এই পড়ন্ত আলোয়! জবা এসে ওর কাছে দাঁড়াল।

কতদিন আগে এই নাম খোদাই করেছিলাম, মনে আছে জবা? বলতে বলতে অবসন্ন দুটি চোখ তুলে চাইলো শোভা।

—খুব মনে আছে!

শোভার পাশটিতে বসলো জবা। ঘরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে বসতে হয় বড় মাসিমার ভয়ে। বাগানের মধ্যে আপাতত সে ভয় নেই। শোভার শীর্ণ একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, কেমন আছিস আজ?

শোভাকে মুখ ফুটে জবাব দিতে হোলো না। কাশীর ধমকে সারা শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। আঁচল দিয়ে বাতাস করতে লাগলো জবা।

সামলে উঠতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো। তারপর শোভা বললে

গাছটির দিকে চেয়েঃ আমি যখন থাকবো না, তখন মাঝে মাঝে এখানে আসিস।

—ওসব কথা বোলো না! জবা ভারী গলায় বললোঃ তোমার বাইরে আসা আজ সত্যি অন্যায় হয়েছে। গায়ে তোমার জ্বর রয়েছে।

—জ্বর তো আর যাবে না ভাই—তাই বলে বাইরে আসবো না। ঘরে শুয়ে শুয়ে যে আর ভালো লাগে না।

—কিন্তু ডাক্তার ঘোষ যে তোমায় শুয়ে থাকতেই বলেছেন।

—হ্যাঁ, ভারি তো একরত্তি ছোকরা ডাক্তার! তার কথায় শুয়ে থাকতে হবে! একটু দম নিয়ে শোভা আবার বললোঃ শুয়ে থাকলেও যা হবে, ঘুরে বেড়ালেও তাই। সারাতে পারবে কেউ?

শোভার কথা শুনলে মনে হয় পৃথিবীতে তার চাওয়া-পাওয়ার কিছু আর নেই। সব ফুরিয়ে শেষ হয়েছে। ভাল লাগেনা জবার। চোখের পাতা ভিজে ভারী হয়ে ওঠে। ধরা গলায় বলেঃ পারবে না কেন? অজয়বাবু কি রকম যত্ন করে চিকিৎসা করছেন তা কি বুঝতে পারো না?

—খুব পারি। কিন্তু কিছুতে কিছু হবে না। আমি জানি। অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে বলে শোভাঃ ছেলেবেলার কথা আমার সব মনে আছে। আমার মাকে, দিদিকে এমনি করেই যেতে দেখেছি। কেউ কিছু করতে পারবে না।

থাক ওসব কথা। রোজ রোজ শুনতে আমার ভাল লাগে না।

মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে জবা। কার বিরুদ্ধে বুকের মধ্যে যেন একটা অভিযোগ জড় হয়ে উঠছে।

কেন বাঁচবে না শোভা? কেন তাকে চলে যেতে হবে? কি তার অপরাধ?

কখন অন্ধকার হয়ে এসেছে টের পায়নি ওরা। অন্যান্য মেয়েরা চলে গেছে। আশ্রম-মন্দির থেকে সান্ধ্য-উপাসনার আওয়াজ ভেসে আসতেই চমকে উঠলো দু'জনে।

জবা বললে: আর তোমায় বাইরে থাকতে দেবো না, চলো। দুজনে ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে চললো।

রেণু, বীণা, কেতকীর দল ছুটতে ছুটতে এই দিকে ফিরে আসছিল।

—খবর শুনেছ জবাদি? হাঁফাতে হাঁফাতে বললে রেণু।

কি খবর?

পাসের খবর। তুমি পাস করেছ ফার্স্ট ডিভিসনে!

খুশীতে ভরে উঠলো জবার মুখচোখ। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই মনে পড়লো শোভার কথা। একটু ইতস্তত করে, কুণ্ঠিত ভাবে বললে: আর শোভা?

—শোভা টোভা সবাই ভক্কা। কে একজন বলে উঠলো।

জবা আর মুখ তুলে চাইতে পারলো না। শোভা এই অসুস্থ শরীর নিয়েই পরীক্ষা দিয়েছিল। কারও মানা শোনে নি। ফল যে কি হবে তাও এক রকম জানাই ছিল। তবু, খবরটা যে শোভার পক্ষে কি ভয়ঙ্কর কঠিন ভাবতেই জবার চোখে জল এল।

কিন্তু শোভা যেন এ আঘাত সইবার জন্যে মনে মনে তৈরী হয়ে ছিল। হাসতে হাসতে বললে: তাতে কি হয়েছে ভাই? তুই পাস করেছিস তাতেই আমি খুশী।

—এ রকম পাস আমি করতে চাই নি! জবা যেন গুমরে উঠলো।

—কেন, আমি ফেল করেছি বলে? তেমনি হাসতে হাসতে বললে শোভা: আরে, সবাই কি পাস করতে পারে? জীবনে ফেল করবার জন্যেই যে আমি জন্মেছি।

শোভা যেন নিজের ভবিতব্যকে নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছে। জবা কিন্তু এতে রাজী নয়। ভাগ্যকে সে নিজের হাতে গড়তে চায়। শোভার কথার মধ্যে যতবড় সত্যিই থাক, ওটা যেন সে মেনে নিতে পারে না। শোভাকে নিয়ে বিষন্ন মুখে ও আবার ভিতরের দিকে এগোয়।

পিছন থেকে রেণু বলে: বা রে! পাসের খবর শোনালুম, বকশিস দেবে না?

—ছাই দেবে!

দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দেয় জবা।

দিন কয়েক পরের কথা।

এক রাশ পেয়ারা পকেট বোঝাই করে সাধন এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিল: কই গো দিদিমণিরা!

মেয়েদের সবাই—ছোট থেকে বড় সবাই—ওর দিদিমণি। গলার আওয়াজ পেয়েই তারা ছুটতে ছুটতে এসে সাধনকে ঘিরে ফেললো।

—কি সাধনদা? সবারই চোখে-মুখে কৌতূহল আর উৎকণ্ঠা।

—বলো তো কি?

বলবার দরকার হোলো না। রেণু তার আগেই সাধনের ঝলঝলে কোটের পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে গোটা কয়েক পেয়ারা বা'র করে নিয়েছে।

—অ্যাঁ! চুরি করে নেওয়া!

সাধন হাসতে হাসতে এবার নিজেই পকেট থেকে পেয়ারাগুলো বা'র করে মেয়েদের মধ্যে বিলি করতে শুরু করে।

—পেয়ারা কোথায় পেলে সাধনদা? ডাঁশা একটা পেয়ারায় কামড় বসাতে বসাতে বীণা জানতে চায়।

সাধন বলে: গাছ থেকে পেড়ে আনলাম গো দিদিমণি, গাছ থেকে পেড়ে আনলাম।

—হ্যাঁ, গাছ থেকে পেড়ে এনেছো না ছাই! বিশ্বাস করে না বীণা, বলে: নিশ্চয়ই কিনে এনেছো!

জবা বলে: আচ্ছা সাধনদা, কতই বা তুমি মাইনে পাও! অথচ যখন তখন আমাদের নানা জিনিস কিনে খাওয়াও! তোমার চলে কি করে বলোতো?

—চলে যায় দিদিমণি, বেশ চলে যায়। তোমাদের খুশী দেখেই আমার

চলে যায়!—বলতে বলতে সাধন ব্যূহভেদ করে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে।

কিন্তু দিদিমণির দল ওকে ছাড়বে কেন?

রেণু বলে: তোমার আপনার লোক কেউ নেই বুঝি—?

—বল কি দিদিমণি! নেই আবার! একেবারে পরম আপন জন রয়েছে। তবে পেয়েও যে তাকে পাইনা। কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

সাধনদার সব ভালো। কেবল এই হেঁয়ালীগুলোর বিন্দুবিসর্গ রেণুর মাথায় ঢোকেনা। রীতিমত ভাবতে ভাবতে সে প্রশ্ন করে: কেন ধরে রাখতে পারো না?

—কই আর পারি!

সাধন ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বুঝি ওদের সকলের অলক্ষ্যে। চোখ দুটি হঠাৎ যেন গাঢ় হয়ে আসে। সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। তারপর হাসি-মুখে, হেলে দুলে গান শুরু করে দেয়:

খাঁচায় ধরে তারে রাখতে পারি কই
সেতো নয় পোষা ময়না
দিবানিশি কত সাধাসাধি করি,
তবু কোন কথা কয় না।
জানি না কি দিয়ে তুষি' তারে
যা কিছু দিতে চাই মাথা নাড়ে
ওযে চায়না সরু কাপড় গয়না।

গানের মাঝখানেই জগা কখন পা টিপে টিপে সেখানে এসে পৌঁছেছে। এই সকাল বেলা মেয়েদের নিয়ে গান! ভয়ে তার জিব শুকিয়ে উঠলো। সাধন ওর দিকে ফিরতেই বললে: আবার তুমি ওই সব অসভ্য, কুচুকুরে গান গাইছ!

সাধনের তখন ও কথায় কান দেবার সময় নেই! ভাবের জোয়ার লেগেছে সারা গায়। বাউলের মত হাত ঘুরিয়ে নেচে নেচে গাইতে লাগলো:

ও তার মন পাওয়া যে বিষম দায়,
মনের মাঝে থাকে তবু তল তার
ডুব দিয়ে ক'জনে পায় !

সাধনের কাছে আমল না পেয়ে জগা মনে মনে চটে উঠলো। মেট্রন আর স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে খবর দেবার জন্যে সরে গেল সেখান থেকে আস্তে আস্তে। সাধন তখনও গেয়েই চলেছে :

জানিনা কিসে তার হদিস মেলে
বিবাগী হবো এবার পুঁজি-পাটা ফেলে
পেয়ে আর না পাওয়া সয় না !

গান শেষ হবার আগেই মেট্রন শ্রীমতী চারুশীলা রায় মূর্তিমতী নিয়ম-শৃঙ্খলার মতো ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। গান বন্ধ হতেই তাঁর গলার আওয়াজে চারদিক কেঁপে উঠলো : তোমায় কতবার বলা হয়েছে সাধন, মেয়েদের কাছে যা তা গান গাইবে না।

—আজ্ঞে, যা তা গান তো···মাথা চুলকোতে লাগলো সাধন। চারুশীলা দ্বিতীয়বার গর্জন করে ওঠবার আগেই স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজমোহন এসে পৌছলেন।

—কী, হয়েছে কী ? এত গোলমাল কিসের ?

—সাধনকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। ও তো কোন কথাই শোনে না।

গম্ভীর মুখে একটা 'হুঁ' উচ্চারণ করলেন শুধু ব্রজমোহন। তার পরেই চোখ পড়ে গেল মেয়েদের হাতের পেয়ারাগুলোর ওপর। তখনও কে একজন কচ্ কচ্ করে একটা কাঁচা পেয়ারা চিবোচ্ছিল একেবারে ব্রজমোহনের মুখের ওপর।

সাধন বললে, আজ্ঞে···পেয়ারাগুলো আমিই দিয়েছিলাম।

—তুমি দিয়েছ ? কেন শুনি ? ব্রজমোহনের দাড়ির অরণ্য থেকে সিংহনাদ উঠলো এবার : কিচেনে যা রান্না হয় তার বাইরে এদের কিছু দেবার হুকুম নেই, এ তুমি জানো না ?···জানো, এতে আশ্রমের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় !

—আজ্ঞে, এরা ছেলেমানুষ, ওদের এটা সেটা একটু খেতে সাধ তো হয়! আবার মাথা চুলকোতে লাগলো সাধন।

সে সাধ মেটাবার ভার তো তোমার ওপর নেই। ব্রজমোহন এবার রায় দিলেন: আমি অত্যন্ত দুঃখিত সাধন।...কিন্তু এ আশ্রমের আদর্শ আর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তোমায় আজ থেকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। এখন থেকে তুমি আর আশ্রমে ঢুকবে না।

ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে কেউ ভাবতে পারে নি। বোধ হয় জগন্নাথও না। একটু মজা দেখবার জন্যেই সে চারুশীলা আর ব্রজমোহনকে খবর দিয়েছিল। ব্রজমোহনের হুকুম শুনে মেয়েদের মুখ শুকিয়ে গেল। জবা তো একেবারে রাগে ফুলতে লাগলো। শুধু সাধনেরই মুখের হাসি মিলালো না। একটু চুপ করে থেকে বললে: যে আজ্ঞে। চলি তা হলে। চলি দিদিমণিরা...

জবা ভেবেছিল সাধন নিশ্চয় প্রতিবাদ করবে। অন্যান্য মেয়েরাও কিছু বলবে সাধনের হয়ে। কিন্তু বড় মাসিমা ও ব্রজমোহনের সামনে কারও মুখ দিয়ে একটি কথাও বা'র হোলো না। কিন্তু সাধন নিজেই যখন এত বড় অবিচারটা বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিল, জবা আর তখন চুপ করে থাকতে পারলে না। চারুশীলার সামনে এসে বললে: সাধন-দার সত্যি কোন দোষ নেই। আমরাই ওর কাছে খাবার বায়না করি, গান শুনতে চাই—

—থামো। তোমাদের কাছে কোন কৈফিয়ৎ আমরা চাইনি। যাও, এখানে জটলা কোরো না। যে যার ঘরে যাও—

চারুশীলা কর্তব্য সম্পাদন করে প্রস্থান করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজমোহন। সাধন আগেই অন্তর্ধান করেছিল। মেট্রন আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে মেয়েদের রুদ্ধ আক্রোশ এবার যেন একশোখানা হয়ে ফেটে পড়লো:

বীণা বললে: আমার যা রাগ হচ্ছে ভাই কি বলবো!

—সাধনদা চলে গেলে, আশ্রমে আর কোন মজাই থাকবে না। রেণু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

—আচ্ছা, এর শোধ আমরা নেবোই নেবো। দেখিস। প্রতিজ্ঞা করে বললো কেতকী।

কথা বললে না শুধু জবা। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে, কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। শোভার অসুখ। ভাল করে আলাপ করবার মতো একটি সঙ্গী পর্যন্ত নেই। ভরসার মধ্যে সাধনদা। তারও জবাব হয়ে গেল অকারণে। এর পরেও তাকে এখানে থাকতে হবে? জবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবে। কিনারা খুঁজে পায় না।

নলিনীদির ডাক শোনা গেল: জবা, শিগগির এদিকে এসো! শোভা তোমায় ডাকছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে এলো শোভার ঘরে।

নলিনীদি শোভার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। জবা তাঁর পাশটিতে বসে জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে শোভা?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। কথা কইতে কইতে খুক্ খুক্ করে কাশছে শোভা: বুকের ভেতরটা কি রকম করে উঠলো, তাই তোকে ডেকে পাঠালাম।

পাশের ছোট টেবিলটার ওপর হরলিক্সের বোতল, ওষুধের শিশি, কয়েকটা বেদানা আর কমলালেবু! ওষুধের শিশিটার দিকে চোখ পড়তেই বোঝা গেল, সকালের ওষুধটা শোভা খায় নি। জবা জিজ্ঞাসা করলে, ওষুধ খেয়েছো?

—ওষুধ খেয়ে আর কি হবে? শেষ রাত্রের ক্ষীণ চাঁদের মতো একটু হাসলো শোভা।

নলিনীদি বললেন: এ তোমার ভারি অন্যায়।

—বলুন তো নলিনীদি, ওষুধ না খেলে অসুখ সারবে কি করে? জবাও অনুযোগ করলে।

শোভা বলে: ওষুধ খেলেই কি সারবে?

নলিনীদি বললেন: আচ্ছা, আর পাগলামি করতে হবে না। জবা তুমি ওষুধটা খাওয়াও। আমি এখন যাচ্ছি—

নলিনী চলে গেলেন। জবা টেবিল থেকে ওষুধের শিশিটা তুলে নিয়ে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললে: এ আশ্রমে সাধনদা ছাড়া এক নলিনীদিরই যা মায়া-দয়া একটু আছে—

—ও দুজনও তাই এখানে না থাকলেই ভাল হয়! শোভা বলে উঠলো।

—সে আবার কি কথা! তুই যে কি সব বলিস, মাঝে মাঝে মানেই বুঝি না।

—ঠিকই বলি। মরুভূমিতে দু'ফোঁটা জল পড়ে লাভ কি! তাতে তেষ্টার যন্ত্রণাটা শুধু বাড়ে।

—আজ সাধনদারও জবাব হয়ে গেল, এই মাত্র। আমাদের ফাইফরমাস খাটবার একটা লোকও আর থাকবে না।

—সাধনদার অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। ও এখানে একেবারে বেমানান। এখানে সব ছাঁচে-ফেলা মানুষ দরকার—ঠিক বড় মাসিমার মতো হলেই ভালো হয়। নলিনীদিকেও একদিন তাড়াবে, দেখে নিস।

—আচ্ছা, ওষুধটা এখন খেয়ে নে দেখি। আমরা তো আর চিরকাল এখানে থাকচি না।

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ওষুধটুকু খেয়ে শোভা বলে: তুই থাকবি না, কিন্তু আমি আর কোথায় যাব! এইখানেই আমার শেষ!

মৃত্যুকে অবধারিত জেনে তারই জন্যে শোভা যেন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে!

জবা চোখের জল লুকোতে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে: ফের যদি ওসব কথা বলিস, আমি আর তোর কাছে আসবো না।

—না ভাই, রাগ করিসনি। জবার একটি হাত চেপে ধরলো শোভা: তুই যতটুকু কাছে থাকিস ততটুকুই ভালো লাগে।

এ কথা মুখ ফুটে বলতে হবে কেন? জবা জানে, এ কথা কত বড় সত্যি। কিন্তু শোভার প্রতীক্ষা যদি পূর্ণ হয়, এইখানেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তারপর—? কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না বোধ হয়।

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ চুকেছে অনেক কাল আগে, আত্মীয়রা তাদের জন্যে শোক করবার ফুরসৎ পাবে কোথা থেকে! সাধনদা গেল, শোভাও বুঝি যাবে একদিন। গোটা আশ্রমবাড়িটা শ্মশানের মতো শূন্য হয়ে উঠবে জবার চোখে। তবু এখানে থাকতে হবে? নিজের পথ সে করে নিতে পারবে না?

শোভার পাশটিতে বসে পড়ে জবা বললো: তুই না ছাড়লে আমি আর কোথাও যাব না ভাই।

নিঃশব্দে প্রার্থনা করে মনে মনে: শোভা ভাল হয়ে উঠুক, সুস্থ হয়ে উঠুক, এখানকার আর পাঁচটি মেয়ের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াক। জীবনে এখনও কত কি চাইবার আছে, কত কি আছে পাওয়ার। তার আগেই কেন ছেদ পড়বে ওর জীবনে? কেন জীবনকে প্রাণ ভরে উপভোগ করবার মতো দীর্ঘ পরমায়ু পাবে না শোভা? কেন, কেন, কেন—?

বিধাতাপুরুষের খাতায় বুঝি এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

শোভার অবস্থা ভাল হওয়া দূরে থাক্ ক্রমেই যেন আরও খারাপ হয়ে পড়ে। নলিনী আর চুপ করে থাকতে পারলে না। প্রথমে চারুশীলা এবং তারপর ব্রজমোহনবাবুর কাছে গিয়ে ভালো রকম চিকিৎসার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল।

ব্রজমোহনবাবু সান্ধ্য এবং প্রাতঃকালীন উপাসনা সম্বন্ধে যতখানি সজাগ, আশ্রম-বাসিনীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ততখানি নিরুদ্বেগ।

মেট্রন চারুশীলা দেবী কিছু কিছু খোঁজ খবর রাখলেও আশ্রমের নিয়ম-কানুন বজায় রাখতেই তাঁর সময় যায় বেশি। ওঁরা দু'জনে কেউই প্রথমে শোভার অসুখটাকে ভয়ঙ্কর কিছু বলে মানতে রাজী হন নি। নলিনীর কথায় ওঁরা একটু সজাগ হয়ে উঠলেন। অজয় ডাক্তার ওষুধপত্র দিচ্ছে এইটুকু জেনেই ওঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন তাকে ডেকে পাঠিয়ে আর একবার ভালো করে শোভার স্বাস্থ্য পরীক্ষার হুকুম দেওয়া হোলো।

অজয় শোভাকে দেখতে এলো। ব্রজমোহন এবং চারুশীলাও তার সঙ্গে

এই প্রথম শোভার ঘরে ঢুকলেন। নলিনী আর জবা আগে থেকেই সেখানে ছিল।

বাইরে থেকে যেটুকু পরীক্ষা করা যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তা শেষ করে অজয় মিনিট খানেক চুপ করে বসে রইলো। মুখে চিন্তার ছায়া। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে: এঁকে দেখাশুনো কে করে?

ব্রজমোহন দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সংক্ষিপ্ত একটা ঢোঁক গিললেন, তারপর বললেন: এই আমরা—মানে সবাই করে।

অজয় বললে, সবাই দেখাশোনা করলে রোগীর কোন সেবাই হবে না। দায়িত্ব নেবার মতো একজন কেউ থাকা দরকার।

ব্রজমোহন চাইলেন চারুশীলার দিকে, চারুশীলা গম্ভীর মুখখানা গম্ভীর-তর করে চাইলেন নলিনীর দিকে। কেউ কিছু বলবার আগেই জবা বললে: দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি।

—আপনি! অজয় ডাক্তারের চোখে-মুখে বিস্ময় এবং কৌতুক। চারুশীলা তাড়াতাড়ি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: তা ও পারবে। ওদের দু জনের খুব ভাব কিনা।

ওঁর ভয় ছিল ডাক্তার বুঝি দায়িত্বটা তাঁকেই নিতে বলে। জবা ভার নিতে চাওয়ায় উনি যেন বেঁচে গেলেন।

ডাক্তার কিন্তু সন্তুষ্ট হোলো কিনা বোঝা গেল না। একটু চুপ করে থেকে বললে: ভাব থাকলেই রোগীর সেবা করা যায় না।

জবার মুখ ভারী হয়ে উঠলো। ডাক্তার সে দিকে লক্ষ্য না করেই বললে: আচ্ছা, পরে আপনাকে কয়েকটা কথা বলবো।

অজয় উঠে পড়লো। যেতে যেতে ব্রজমোহনকে বললে: ওঁকে একবার ডাক্তারখানায় পাঠিয়ে দেবেন। ওষুধপত্র কখন কোন্‌টা খাওয়াতে হবে ওঁকে বলে দেবো।

অজয় ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ব্রজমোহন এবং চারুশীলাও এলেন তার পিছনে পিছনে।

কয়েক পা গিয়েই ব্রজমোহন প্রশ্ন করলেন : অসুখটা সত্যি কি বুঝছেন বলুন তো অজয়বাবু। ভয়ের কিছু আছে?

অজয় কিছু বলবার আগেই চারুশীলা বলে উঠলেন : আমার তো মনে হয় যতো না অসুখ তার চেয়ে ঢং বেশি। আজকালকার মেয়েদের ওই এক ফ্যাশান কিনা।

মুখখানা বিকৃত করে অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করলেন। শোভার ঘরে গিয়ে এঁদের কথাবার্তা শোনা অবধি অজয়ের মনটা এঁদের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। সে একটু উত্যক্ত ভাবেই বললে : ফ্যাশান যদি হয় তা হলে বড় মর্মান্তিক ফ্যাশান বলতে হবে। নিজেদের জীবন দিয়ে এ রকম ফ্যাশান চালানো তো সোজা কথা নয়।

একটু চুপ করে থেকে কঠিনতর কণ্ঠে বলে উঠলো : শুনুন, এই মেয়েটির অসুখ দস্তুর মতো শক্ত গোছের। ভালো রকম চিকিৎসা করেও বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ।

জবা কখন শোভার ঘর থেকে বেরিয়ে চারুশীলার পিছনে দাঁড়িয়েছিল কেউ লক্ষ্যই করেনি। সে নীরবে এদের কথাবার্তা শুনে যেতে লাগলো।

অজয়ের মন্তব্য শুনে ব্রজমোহনের মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। তিনি বললেন : বলেন কি অজয়বাবু। আমরা তো—

—আপনারা ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যই করেন নি এবং অবহেলা করবার জন্যেই রোগ এতটা বেড়ে গেছে। অজয় তেমনি রূঢ়ভাবে বললো : আলাদা একটা ঘরে এঁকে ফেলে রেখেছেন বটে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, ওষুধ-পত্রের দিকে কিছুই নজর দেওয়া হয় নি।...

চারুশীলা বললেন : আশ্রমে জায়গার কি রকম অভাব তা তো জানেন। তবু আমরা ওকে আলাদা রেখেছি, আর আপনি বলছেন—

—আমি কিছুই বলছি না। চোখের ওপর যা দেখলাম তাই আপনাদের জানিয়ে গেলাম। এখানে যদি ঠিক মতো সব ব্যবস্থা না করতে পারেন তা হলে কোনো হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। শুধু ওষুধে এ রোগ সারে না, সেবা আর পথ্য এ দুটো জিনিসও সমান দরকার—

—না, না, সে কি বলছেন! ব্রজমোহন বলে উঠলেন: আশ্রমের মেয়েদের জন্যে আমরা তো সব কিছু করতে প্রস্তুত। ওরাই তো আশ্রমের প্রাণ। দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়—

বলতে বলতে তিনি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। চারুশীলাও তার পিছু নিলেন।

অজয় নীচে নামছিল, পিছন থেকে জবা ডাকলো: ডাক্তারবাবু—

অজয় ফিরে দাঁড়ালো।

—শোভার কি আর বাঁচবার আশা সত্যিই নেই?

সোজাসুজি এমন একটা প্রশ্নের জন্যে কোন ডাক্তারই প্রস্তুত থাকে না। অজয়ও ঘাবড়ে গেল। কিন্তু তখনই আবার সামলে নিল। একটু চুপ করে থেকে বললে: সে কথা আপনাকে কে বলেছে?

—না, আমার কাছে লুকোবেন না। আমি এই মাত্র আপনার সব কথা শুনেছি। সত্যি করে বলুন, শোভা আর সারবে কিনা? কথা বলতে বলতে জবার চোখে বুঝি জল এসে পড়েছিল।

অজয় ডাক্তারের নিরুত্তাপ মনেও বুঝি তার ছোঁয়া লাগলো, ঘা পড়লো সহানুভূতির পর্দায়।

—দেখুন, আমি ধন্বন্তরীও নই, গণক ঠাকুরও নই। তবে সাধারণ ডাক্তার হিসাবে শেষ পর্যন্ত সারাবার চেষ্টা করাই আমার কাজ। আশা আমরা কখনও ছাড়ি না।

—শোভাকে সারিয়ে আপনাকে দিতেই হবে ডাক্তারবাবু। ও নিজে বাঁচতে চায় না, সেই জন্যেই, যেমন করে হোক, ওকে বাঁচিয়ে তোলা দরকার। এখানকার কড়া নিয়ম-কানুনের জন্যে আমাদের কিছুই করবার উপায় নেই—আপনাকেই ওর ভার নিতে হবে। ও যদি না বাঁচে—

আবেগে, উত্তেজনায় জবা কথাটা আর শেষ করতে পারলো না।

অজয় বললে, অত অস্থির হচ্ছেন কেন? বাঁচবার আশা একেবারেই নেই, এমন কথা তো আমি একবারও বলিনি। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা

আমি করবো এবং এ রোগ এখনও চিকিৎসার বাইরে যায় নি, এইটুকু জেনে রাখুন।

অজয় আর দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

জবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর চোখের জল মুছে শোভার ঘরের দিকে ফিরলো।

যখন শোভার ঘরে ঢুকলো তখন কে বলবে, একটু আগে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিল।

—এখন থেকে আমার হুকুম মতো চলতে হবে, বুঝলে? ডাক্তারের কাছ থেকে সেই জন্যেই তো সব ভার নিলাম।

বলতে বলতে শোভার বিছানার কাছে এলো জবা।

ম্লান একটু হেসে শোভা বললেঃ ভার যেন এতোদিন আর কেউ নিয়েছিল! কিন্তু তুই মিছিমিছি চেষ্টা করছিস ভাই। আমায় ভালো করতে তুই পারবি না জবা। ভালো হতে আমি চাই না।

—ফের ওই কথা! আমি কিন্তু—

রাগের ভান করে জবা ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করে।

—যাসনে জবা, শোন্। আর হয়তো সব কথা তোকে বলে যাবার সময় পাবো না।

—কিন্তু আমি যে তোমার ওসব কথা শুনতে পারি না। বলতে বলতে ফিরে এলো জবা। মুখ-চোখ আবার ছলছল করছে বেদনায়।

—তোর কষ্ট হয় জানি। কিন্তু আমার কথা ভেবে তুই মন খারাপ করিস নি। শোভা ক্ষীণ একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলতে লাগলোঃ তোকে তো কতবার বলেছি মরতে আমার এতটুকুও ভয় করে না। ছেলেবেলা থেকে এত দুঃখ দেখেছি—এত দুঃখ পেয়েছি যে মনে হয়, মরে গেলেই আমি শান্তি পাবো।

—দুঃখ তো আমিও অনেক পেয়েছি, কিন্তু ওকথা আমার মনেও হয় না। বলতে বলতে জবার স্বর যেন বদলে যায়ঃ দুঃখ পেয়েছি বলেই মরতে চাইবো, এতো ভীরুর কথা।

—আমি যে সাহসী এমন কথা তো বলিনি। সত্যিই আমি ভীরু। তবে আমার ভয় মরতে নয়, বেঁচে থাকতে।

—না, না, অমন কথা বোলো না। যেমন করে হোক, তোমায় সেরে উঠতেই হবে। অন্তত আমার জন্যে।

জবা ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। তন্দ্রাগ্রস্তের মতো শোভা কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। তারপর বলে ঃ তোর জন্যেই সেরে উঠতে ইচ্ছে করে জবা। শুধু একটা কথা তোকে বলি। জীবনে কাউকে কখনও বিশ্বাস করিস নি, আর কাউকে যেন কোনদিন ভালোবেসে বিয়ে করিস নি। আমার মার মতো তা হলে সারাজীবন কেবল দুঃখই পাবি।

—ওসব কথা আর কতবার বলবি। আমি সব জানি। তোকে কথা দিচ্ছি—বিয়ে আমি কখনও করবো না, ভালোও কাউকে বাসবো না। তুই এখন একটু ঘুমো।

—কত আর ঘুমোবো বল্‌তো? তার চেয়ে যতক্ষণ পারি তোর সঙ্গে গল্প করে নি।

শোভা বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই কাশির ধমক শুরু হয়ে গেল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো। জবা তাকে শুইয়ে দিতে দিতে বললে ঃ না, না, আর তোমায় কথা বলতে দেবো না। বেশী কথা বললে আমি আর এখানে থাকবোই না। চুপ করে শুয়ে থাক। আমি জ্বরটা একবার দেখে রাখি—

থার্মোমিটার নিয়ে জ্বর দেখতে লাগলো জবা।

ডাক্তার চেষ্টার ত্রুটি করলে না, দামি ওষুধপত্রে টেবিল ভরে গেল। বাইরের কোন স্যানিটোরিয়মে নিয়ে যাওয়া যায় কি না সেজন্যও চেষ্টা চলতে লাগলো। সেবাশুশ্রূষার ভারটা জবা আর নলিনী দুজনেই ভাগ করে নিলে। নলিনীকে ক্লাস নিতে হয়, অবসর সময় ছাড়া শোভার কাছে আসতে পারে না। দিনের বেলার সর্বক্ষণ জবাই থাকে শোভার কাছটিতে। রাত জাগার ভারটা নিয়েছে নলিনী।

ডাক্তারী শাস্ত্রে যতরকম ব্যবস্থা আছে তার কোনটাই বুঝি বাদ দেয় না অজয় ডাক্তার। কিন্তু আয়ুর খাতার পাতা যার ফুরিয়ে এসেছে, ডাক্তারী শাস্ত্র তাকে কত দিন আর জোর করে ধরে রাখবে!

সে দিন শোভার হাতে হাত রেখেই চমকে উঠলো জবা।

—একি। একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা!

সন্ধ্যে হয়েছে। ঘরে আলোটা জ্বালা হয় নি। জবা ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে শোভা বললেঃ আমার কাছে একটু বস ভাই জবা। আমার হাতটা একটু ধরে থাক।

এমন অনুরোধ কোন দিন সে করে না। জবা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বসলো। হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিলো। কী ঠাণ্ডা! ঘামে যেন ভিজে গেছে। কপালে হাত রাখলো জবা। কপালও ঠাণ্ডা ঠিক হাতের তালুর মতোই।

শোভার হাতখানি ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে জবা উঠে দাঁড়ালো।

—কোথায় যাচ্ছিস রে? ক্ষীণকণ্ঠে শোভা প্রশ্ন করলে।

এখুনি আসছি।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুলো জবা।

বারান্দা দিয়ে খানিকটা যেতেই নলিনীর সঙ্গে দেখা।

—শোভার হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কি হবে নলিনীদি?

নলিনী কথা বললো না, শোভার ঘরে ছুটে এলো। গায়ে হাত দিয়ে দেখলো, তার পর বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

জবা বললেঃ ডাক্তারবাবুকে এখুনি খবর দেওয়া দরকার। আপনি একটু বসুন নলিনীদি। আমি একটু দেখে আসি—

জবা ছুটতে ছুটতে ডিসপেন্সারীতে এলো।

কম্পাউণ্ডার কার জন্যে বুঝি একটু মলম তৈরী করছিল। জবা তাকেই জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারবাবু কোথায়?

—আজ্ঞে, তিনি একটু বিশ্রাম করছেন।

—তাঁকে শিগগির একবার ডেকে দিন।

—আজ্ঞে, এই সবে বিশ্রাম করতে গেছেন। একটু পরে বরং—

—না, না, জরুরী দরকার। শিগগির ডেকে দিন। যান—

জবার ভাবভঙ্গী দেখে কম্পাউণ্ডার ভড়কে গেল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই হাতের কাজ ফেলে ভিতরে গেল।

ঘরের মধ্যে অজয় তখন ঘুমুচ্ছে। কম্পাউণ্ডার মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইলো, বার দুই কাশলো। অজয়ের ঘুম ভাঙলো না। কম্পাউণ্ডার ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো।

—কি হোলো? এলেন না? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে জবা।

—আজ্ঞে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।...ডাকবার সাহস হোলো না।

জবা এক মুহূর্ত ঠোঁটে ঠোঁট রেখে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললে: বেশ! আপনার সাহস না হয়, আমি নিজেই যাচ্ছি।

কম্পাউণ্ডার বিব্রত হয়ে উঠলো। কিন্তু কিছু বলবার আগেই জবা পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

—'ডাক্তারবাবু! শুনেছেন—

বার দুই ডাকতেই অজয় ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলো। ভালো করে চোখ মেলতেই সামনে জবাকে দেখে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল। সারাদিনের খাটুনির পর হঠাৎ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, লজ্জিতও হোলো তার জন্যে।

—শিগগির চলুন ডাক্তারবাবু, শোভার অবস্থা খুব খারাপ!

অজয়ের মধ্যে কোন ব্যস্ততার ভাব দেখা গেল না, তবে মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো। বিছানা থেকে উঠে গেঞ্জিটা গায়ে দিতে দিতে বললে: খুব খারাপ—?

জবা বললে: হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—

অজয় টেবলের দিকে এগিয়ে গেল। হাত ব্যাগটা খুলে, আলমারি থেকে কয়েকটা ওষুধ এনে তাতে ভরতে লাগলো।

জবার কিন্তু দেরী সইচে না। কাঁদ কাঁদ ভাবে বলে উঠলো: দেরী করবেন না ডাক্তারবাবু। হয়তো গিয়ে আর দেখতেও পাব না।

—অতো অস্থির হবেন না, অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই।

অজয় আলমারী থেকে ইঞ্জেকশানের একটা সিরিঞ্জ বার করতে করতে জবাব দিলে।

জবা কিন্তু আর স্থির থাকতে পারলো না। প্রায় ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলো : আপনাদের মতো লাভ লোকসান হিসেব করে এখনও স্থির থাকতে শিখিনি। আপনি আসবেন কি না তাই বলুন।

—যাবার চেষ্টাই তো করছি। হাসতে হাসতে বললো অজয় : কিন্তু শুধু গেলেই তো হবে না। যা দরকার হতে পারে সেগুলোও সঙ্গে নিতে হবে।

বলতে বলতে আলনা থেকে একটা জামা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে লাগলো। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কতকগুলো শক্ত কথা বলে ফেলার জন্যে জবার অনুশোচনার আর অন্ত ছিল না। একটু চুপ করে থেকে বললে : কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু। কি বলতে কি বলছি আমি নিজেই জানি না। শোভাকে আপনি সারিয়ে তুলবেন বলেছিলেন, সে কথা আপনাকে রাখতেই হবে।

টেবল থেকে ব্যাগটা তুলে নিতে নিতে অজয় ম্লান হেসে বললো : আমাদের ক্ষমতা কতটুকু তা যদি জানতেন !—তবু চলুন।

অজয় ডাক্তারকে নিয়ে জবা যখন শোভার ঘরে পৌছলো, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। কথা রেখেছে শোভা, নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা তার সার্থক হয়েছে—আশ্রমের এই পিঁজরের মতো ঘরখানার মধ্যেই নিজেকে সে নিঃশেষ করে দিয়েছে। শেষ মুহূর্তে জবা আর নলিনী ছাড়া আর কাউকে কিছু জানতেও দেয় নি। এখন অবশ্য অনেকেই জড় হয়েছে ঘরের ভিতরে, বাইরে, চারদিকে। ব্রজমোহন আর চারুশীলা এতদিন বেড়া দিয়ে রেখেছিলেন এই ঘরখানার চারিদিকে। নলিনী আর জবা ছাড়া কারও এখানে আসবার হুকুম ছিল না। আজ বেড়া ভেঙেছে, এসেছে সবাই। ব্রজমোহনবাবু, চারুশীলা। এমন কি জগন্নাথ পর্যন্ত। মেয়ের দল বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছিল নিঃশব্দে। তখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি

জবা। তাদের ভিড় ঠেলেই ডাক্তারকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু ঘরে ঢুকে ডাক্তারের আর পরীক্ষা করবার দরকার হোলো না। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে নীরবেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। জবা লুটিয়ে পড়লো নিষ্প্রাণ শোভার শেষ সজ্জার ওপর। কেউ বাধা দিল না।

হিন্দু সৎকার সমিতিতে টেলিফোন করলেন ব্রজমোহনবাবু। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওদের গাড়ি এসে শোভাকে নিয়ে গেল। শেষটায় আর কার্পণ্য করলেন না ব্রজমোহনবাবু। বাগান থেকে অনেক রকম অনেকগুলো ফুল আনিয়ে ছড়িয়ে দিতে বললেন গাড়ির ওপর। নলিনী আর জবাকে নিয়ে চারুশীলা গেলেন আলাদা গাড়িতে শ্মশান পর্যন্ত। শোভার দেহটা পুড়ে ছাই হবার পর ওদের দুজনকে নিয়ে আশ্রমে ফিরলেন।

শুধু কি তাই? পরের দিন উপাসনা মন্দিরে রীতিমত ঘটা করে শোক সভা ডাকা হোলো। শোভা বেঁচে থাকতে মেয়েদের তার কাছে যেতে দেওয়া হোতো না, কিন্তু শোক সভায় হাজির থাকবার জন্যে প্রত্যেকটি মেয়েকে আলাদা করে টাইপ করা নোটীশ দেওয়া হোলো।

উপাসনার সময় ব্রজমোহনবাবু শোভার আত্মার শান্তিকামনায় বৈদিক সূক্ত থেকে গীতার শ্লোক পর্যন্ত সব কিছুই একে একে আবৃত্তি করলেন। কিন্তু তাতেও বুঝি তৃপ্তি হোলো না। তখন রীতিমত গলা কাঁপিয়ে দীর্ঘ একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। অশ্রু অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন:

আজ এক পরম শোকের দিনে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের পরম স্নেহের পাত্রী, এখানকার সকলের প্রিয়, আশ্রম-দুহিতা কুমারী শোভনা আর আমাদের মধ্যে নেই। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপার মহিমা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। আমাদের সামনে অকালে একটি কুসুম কোরককে বৃন্ত থেকে আমরা ঝরে পড়তে দেখলাম, কিন্তু কোন্ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এই অপূর্ণ জীবনের মাঝখানে হঠাৎ ছেদ টেনে দিলেন তা শুধু তিনিই জানেন। পরম স্নেহাস্পদার বিয়োগ ব্যথায় আজ আমরা বিধুর, তবু তাঁর করুণা সম্বন্ধে আমরা যেন কোন প্রশ্ন না করি।

আমাদের শোক-সাগরে ভাসিয়ে যে বিদায় নিয়ে গেছে তার অশরীরী আত্মার কল্যাণ কামনা করে আমরা শুধু আজ তাকে স্মরণ করবো। তার স্মৃতিই আজ আমাদের সম্বল—

বলেই তিনি চক্ষু নিমিলিত করে, বোধ করি তার অশরীরী আত্মার কল্যাণ কামনাতেই আরও কতকগুলো মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। মেয়েদের মধ্যে কে একজন চাপা গলায় পার্শ্ববর্তিনীকে বললো, মায়া কান্না শুনেছিস? গা আমার জ্বালা করছে।

ফিসফিস আওয়াজটা বোধ হয় চারুশীলার কাণ এড়ায় নি। তিনি বলে উঠলেন: চুপ, চুপ! কথা বলে এ শোক-সভার গাম্ভীর্য, পবিত্রতা, আমাদের আশ্রমের নিয়ম-শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ কোরো না।

মন্ত্রোচ্চারণ সমাপ্ত করে ব্রজমোহন আবার চোখ মেলে চাইলেন। সামনে ছিল রেণু। তাকে লক্ষ্য করে বললেন: আশাকরি তুমি শোভনা সম্বন্ধে এবার কিছু বলবে।

রেণু বিরস কণ্ঠে জবাব দেয়: না, তার সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই।

—বলবার নেই! যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত পেলেন ব্রজমোহন: যে তোমাদের প্রাণের বন্ধু, তোমাদের আশ্রমজীবনের এতদিনের সঙ্গিনী, তার অকাল বিয়োগ কি তোমাকে একটু স্পর্শও করে নি!

রেণু ধীর, স্থির কণ্ঠে জবাব দিল: স্পর্শ করেছে বলেই শুধু দুটো মুখের ফাঁকা কথা তার সম্বন্ধে বলতে চাই না।

তাঁর আন্তরিকতার প্রতি কেউ এমন প্রকাশ্য ভাবে কটাক্ষ করতে পারে, ব্রজমোহনবাবুর ভাবা ছিল না। তিনি মিনিট খানেকের জন্যে হতচকিত হয়ে গেলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে দাড়ির অরণ্যের মধ্যে তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। কিন্তু অন্যান্য মেয়েগুলির দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন, তাদের অনেকেই মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপছে। বুঝলেন, উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই। সামলে নিয়ে বললেন: অকারণ ঔদ্ধত্য দেখিয়ে এই শোক-সভার পবিত্রতা নষ্ট কোরো না।

রেণু চুপ করে রইলো, কিন্তু তার পাশের মেয়েটি ফস করে বলে উঠলো : নষ্ট অনেক আগেই হয়েছে।

ব্রজমোহনের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগলো। মেয়েগুলোর আজ হোলো কি! তিনি এদের আশ্রয় দিয়েছেন, খাওয়া-পরা, লেখা-পড়া সব কিছুর ভার নিয়েছেন···আর তারাই আজ—

ব্রজমোহন বললেন : আশ্চর্য হচ্ছি তোমাদের ব্যবহারে! মনে হচ্ছে, এ শোক-সভা আহ্বান না করলেই বুঝি ভালো ছিল! কিছুক্ষণ স্তব্ধ, গম্ভীর মুখে বসে থাকবার পর চোখ পড়লো জবার ওপর। যথাসম্ভব মোলায়েম-ভাবে বললেন : তুমি—তুমি কিছু বলবে কি জবা? শোভা তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল—

জবা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। কিছু একটা বলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারলো না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শোভার অসুখটা প্রথম যখন বাঁকা পথ ধরলো, তখন জবা একদিন ব্রজমোহনবাবুর কাছে গিয়ে বলেছিল : শোভার অসুখ বড় বেড়েছে। ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকা দরকার।

অফিসের খাতাপত্র ওল্টাতে ওল্টাতে নিস্পৃহকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন ব্রজমোহন : দরকার বললেই তো ডাকা যায় না মা। ডাক্তারের আশ্রমে আসবার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে।

কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করা চলবে না। অসুখ তো নির্দিষ্ট সময় ধরে বাড়ে না।

বড় অন্যায় কথা এসব। নিয়মের এসব ব্যতিক্রম আমি পছন্দ করি না। ব্রজমোহন বিরক্তভাবে অফিসের একটি কেরানীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যাও হে, দেখ একবার, ডাক্তারবাবুকে পাও কি না···

সেই ব্রজমোহন! জবাকে আজ শোভার সম্বন্ধে কিছু বলতে বলছেন। কি বলবে জবা? গোড়া থেকে স্নেহ-যত্ন সেবা-শুশ্রূষা পেলে, উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হলে, শোভাকে এমনি করে চলে যেতে হোতো না। বলেই বা কি লাভ? শোভা তো মরতেই চেয়েছিল। নিজের মৃত্যু দিয়েই

তো সে এই হৃদয়হীন পৃথিবীর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যের প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে। এই প্রকাণ্ড শোক-সভায় সে কথা নতুন করে বলতে গেলে শোভার সমস্ত ত্যাগটাকেই বুঝি ছোট করে ফেলা হবে। শোভা ব্যথা পেয়েছিল অনেক, কিন্তু তার জন্যে খেদ করেনি। ধূপের মতন জীবনটাকে পুড়িয়ে নিঃশব্দে তার পরিমল বিলিয়ে গেছে।' তার সেই নীরব দুঃখভোগ, নিঃশব্দ আত্ম-দানের স্মৃতি পদ্মের মতো জবার নিভৃত মনকে আলো করে রাখুক। তাকে বাইরে পাঁচ জনের সামনে টেনে এনে লাভ কি।

পারলো না, একটি কথাও জবা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলো না। চোখ বেয়ে জল নেমে এলো বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতো···ছুটতে ছুটতে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে চলে এলো একেবারে নিজের ঘরটিতে।

এই ক'মাস নিজের এই ঘরটির সঙ্গে জবার কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। দিন-রাত্রির বেশীর ভাগ সময় কাটতো শোভার ঘরে। একেবারে ওপ্রান্তের শোভার সেই ঘরটা এখন তালাবন্ধ। শোভার মৃত্যুর পরের দিনই চুণকাম করিয়ে ওটাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এখনও বড় একটা কেউ যায় না ওদিকে। জবা শুধু মাঝে মাঝে গিয়ে চুপ করে সেই ঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে পড়ে, প্রথম দিন তার ক্লাসে যাওয়ার কথা। বেলা দুপুর পর্যন্ত না খেয়ে ছিল জবা। শোভা আর সাধন-দা তার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছিল। কোথায় গেল সাধন-দা? সে থাকলেও বুঝি দুটো সান্ত্বনার কথা বলে, জবার মনের ভারটাকে একটু হালকা করে দিতে পারতো। কিন্তু চাকরি যাবার পর সাধনদা আর একদিনও এদিকে এলো না।···ভাল লাগে না, এখানকার কিছুই আর জবার ভাল লাগে না। মনে হয় পালিয়ে যায়। শুধু নলিনী-দি তার পথ আটকে রেখেছেন। সময় পেলেই তার কাছে এসে বসেন। এ-কথা সে-কথায় তাকে অন্যমনস্ক করে রাখতে চান।

শোভা বলে একটি মেয়ে ছিল, আজ নেই—একথা যেন জবা আর নলিনী ছাড়া এত বড় আশ্রমের আর কারও মনেই নেই। এখানে

নিয়ম মতো ঘণ্টা পড়ছে, উপাসনার ঘণ্টা, ক্লাসের ঘণ্টা, খাবার ঘণ্টা, স্নানের ঘণ্টা, রাত্রে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বার ঘণ্টা—কোথাও কোন নিয়মের এতটুকু নড়চড় নেই! ঘণ্টা পড়লেই জবার মাথার মধ্যে যেন ঝন্ ঝন্ করে ওঠে। মনে হয় পালায়, যেমন একদিন পালিয়েছিল মামীমার আশ্রয় ছেড়ে···কিন্তু বয়েস হয়েছে, হঠাৎ বাইরের পৃথিবীতে পা দেবার কথা ভাবলে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়······

কিছুই ঠিক করতে পারে না জবা।

এক-একদিন অন্যমনস্কের মতো সেই প্রকাণ্ড গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায় —যার গায়ে খোদাই করা আছে তার আর শোভার নাম। ছায়াস্নিগ্ধ নির্জন বাগানটার মধ্যে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শোভার সেই কথাগুলো মনে পড়ে যায়······

—আমি যখন থাকবো না, তখন এখানে আসিস জবা।

—আর, কোনদিন কাউকে ভালোবেসে যেন বিয়ে করিস না। আমার মার মতো তা হলে শুধু দুঃখুই পাবি। ছেলেদের ভালোবাসার কোন দাম নেই!

মনের মধ্যে যেন পথের একটা ইসারা দেখতে পায়।···হ্যাঁ, ভাল সে কোন পুরুষকে বাসবে না। চাকরির চেষ্টা করবে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে। নিজের হাতে গড়বে নিজের অদৃষ্টকে······

সেদিনও গাছতলায় দাঁড়িয়ে জবা বুঝি এই কথাই ভাবছিল। হঠাৎ অজয় ডাক্তার সেখানে এসে হাজির। বাগানের মধ্যে দিয়ে ডিস্‌পেন্‌সারীতে যাবার একটা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়ে আসছিল অজয়। জবাকে দেখে এগিয়ে এলো। একটু ইতস্তত করে বললে: একটা কথা আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম। আপনার হয়তো আমার সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছে যে—

অজয়ের কথা শেষ হবার আগেই জবা বলে উঠলো: হ্যাঁ, আপনার ওপর খুব খারাপ ধারণা হয়েছে। কেন আপনি শোভাকে সারিয়ে তুলতে পারলেন না। কেন তাকে ভালো করে দিলেন না!

বলতে বলতে একেবারে যেন ভেঙে পড়লো জবা। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তারপরেই নিজের ছেলেমানুষীর জন্যে লজ্জিত হয়ে দ্রুত পায়ে চলে এলো আশ্রম-বাড়ির মধ্যে। অজয়কে আর একটা কথা পর্যন্ত বলবার অবকাশ দিলে না।—

তারপরও জবা এখানে প্রায় মাস পাঁচেক কাটিয়েছে। প্রতিদিন সকালে উঠে লুকিয়ে খবরের কাগজের পাতা উল্টেছে—যদি সুবিধা মতো একটি কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। সেদিন এই চাকরির খবরটা যখন চোখে পড়লো তখন হঠাৎ ঝোঁকের মাথাতেই দরখাস্ত করে বসেছিল। ভাবেনি যে চাকরিটা পাওয়া যাবে। নলিনীদিকেও তাই কিছু বলেনি। আজ যখন জবাব এলো, তখন মনটাকে স্থির করতে একটু সময় লাগলো বটে; কিন্তু ব্রজমোহন আর চারুশীলার কাছে ছাড়া পাবার পর এখন আর তার কোন সংশয়, কোন সঙ্কোচ নেই। ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে, নলিনীদিকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলো এতদিনের আশ্রয় ছেড়ে—

কলকাতারই একটা সম্ভ্রান্ত পল্লীর ঠিকানা দেওয়া ছিল চিঠিতে। ট্রামে উঠে সেখানে পৌঁছতে খুব বেশী সময় লাগলো না।

একজন বয়োবৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত জমিদার···সম্প্রতি রোগে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, তাঁরই দেখা-শুনো, সেবা-শুশ্রূষার ভার নিতে হবে জবাকে। বিনিময়ে থাকা, খাওয়া এবং নগদ কিছু পারিশ্রমিকও পাওয়া যাবে। পারবে, নিশ্চয়ই সে পারবে। প্রথম প্রথম হয়তো একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নেবে নিশ্চয়ই।

ভাবতে ভাবতে জবা সাতাশি নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। সাবেক ধরনের প্রকাণ্ড বাড়ি···বাগান, গেট। গেটের উপর শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা: মহেন্দ্রপ্রতাপ চৌধুরি।

জবা সাহস করে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। কিন্তু ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। সুরকি-ঢালা সরু পথটা ধরে জবা বাড়ির মধ্যে এসে পড়লো। এখানেও কেমন একটা চুপচাপ ভাব। জমিদার বাড়ি, জবা

কল্পনা করেছিল, লোকজন, আমলা-গোমস্তার হাঁকডাকে চারিদিক সরগরম হয়ে থাকবে। অনেকক্ষণ এদিক ওদিকে চাইবার পর ডানহাতি একটা ঘরের মধ্যে চশমা-পরা একটি প্রৌঢ়কে বসে থাকতে দেখা গেল। রোগা চেহারা, গলার কণ্ঠাটা উঁচু হয়ে উঠেছে, বসে বসে পাঁজির পাতা উল্টোচ্ছিলেন। নায়েব গোমস্তা বলেই মনে হোলো। জবা ভিতরে আসতেই লোকটি চশমার মধ্যে দিয়ে বিস্মিত এক জোড়া চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে রইলো।

জবা চিঠিখানা বার করে লোকটির হাতে দিল।

চিঠিখানি পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি যেন একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—চলুন, ভিতরে চলুন। পিসিমার সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দিই?

পিসিমা! জবা একটু চুপ করে থেকে বললেঃ আমি কিন্তু মহেন্দ্র—মানে জমিদারবাবুর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম। লোকটি একটু ইতস্তত করে বললেঃ কর্তাবাবু তো সহজে কারও সঙ্গে দেখা করেন না। পিসিমার কাছে চলুন, তাঁর ওপরই সব ভার, তিনিই সুবিধে মতো—

—কর্তাবাবু কারও সঙ্গে দেখা করেন না?

—করেন বৈকি। তবে তার সময় আছে, সুযোগ আছে। মন-মেজাজ ঠিক থাকার কথা আছে। সে অনেক ব্যাপার। থাকতে থাকতেই সব বুঝতে পারবেন। আসুন, আমার সঙ্গে—

বলতে বলতে লোকটি অন্দর মহলের রাস্তা ধরলো।

সরু একটা গলি পার হলেই মস্ত বড় উঠোন। উঠোনের কোলে রান্না-বাড়ি। পিসিমাকে সেইখানেই পাওয়া গেল। জন চার-পাঁচ ঝি-চাকরকে তিনি কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, কুটনো থেকে বাটনা—সব।

সরকারের সঙ্গে জবা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। জবার পরিচয়টা সরকারই দিলে। পিসিমা মোটা সোটা বিধবা মানুষ। কোন কথা বললেন না, চুপ করে জবাকে দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেনঃ তুমি নিজেই কাজ করবে?

জবা ঘাড় নাড়লো।

পিসিমার কিন্তু উৎসাহের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আবার খানিক চুপ করে থেকে তিনি চাকরদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যাঁরে, বাবুর খবর কি?

চাকরটা বললে : সকাল থেকে তো ভালই আছেন।

—গোলমাল নেই কিছু?

—কই, এখনও তো—

—তা হলে দেখি একবার গিয়ে। বলতে বলতে পিসিমা কুটনোর আসর ছেড়ে উঠলেন : চলো বাছা। এখন তোমার কপাল আর আমার হাত যশ।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো জবার। এ বাড়ির লোকগুলোর কথাবার্তায় কি যেন একটা হেঁয়ালীর ভাব দেখা যাচ্ছে। ব্যাপার কি? এরা কি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছে?

কে জানে কি! এখন আর ভাববার সময় নেই। পিসিমার সঙ্গে সঙ্গে জবাকে আর এক মহলে পৌছতে হোলো। এইটেই কর্তাবাবুর মহল, যাকে বলে খাস। মস্ত চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে উপরের দিকে। সিঁড়ির ওপর কার্পেট বিছানো। নিচের হলটিও দামী আসবাবপত্রে সাজানো। এতো বড় ঘর, এতো আসবাব, জবা জীবনে দেখে নি। কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। পিসিমাও সিঁড়ির কাছে পৌছে আর যেন নড়তে চাইলেন না। মনে হোলো ঠিক এই সময় জবাকে নিয়ে উপরে ওঠা উচিত হবে কি না তাই ভাবছেন যেন। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে তিনি উপরের দিকে চাইতে লাগলেন। যেন ভয়ঙ্কর দুঃসাহসের কাজ করতে চলেছেন, এমনি একটা ভাব।

মিনিট খানেক অপেক্ষার পর তিনি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে স্বরু করলেন পা টিপেটিপে—হাতের ইশারায় জবাকেও আসতে বললেন তাঁর পিছনে পিছনে। মাত্র চার পাঁচটা ধাপ পার হয়েছে দু'জনে, হঠাৎ উপর থেকে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ শোনা গেল : পাজি, স্টুপিড, রাস্কেল।

জবা চমকে সিঁড়ির রেলিংটা ধরে ফেললো। পিসিমার মুখের চেহারা বদলে গেল, তিনিও থমকে দাঁড়ালেন।

আওয়াজটা মানুষের গলার, কিন্তু হঠাৎ মনে হোলো, গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে বুঝি বাঘ গর্জন করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, জন তিনেক চাকর দম বন্ধ করে, ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে—

পিসিমা সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দিলেন। জবাও ভয়ে ভয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। আর ঠিক সেই সময় উপর থেকে কতকগুলো কাঁচের বাসন—ডিশ্, কাপ ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে নিচে ভেঙে পড়লো। আর একটু হলে সেগুলো বুঝি পিসিমার মাথাতেই পড়তো।

ডিশ্ কাপের ঝন্‌ঝন্ শব্দ থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার উপর থেকে সেই বিকট গর্জন : ফের যদি ওসব নিয়ে এসেছ তো আমি তোমাদের গুলী করে মারবো। ইডিয়ট, রাস্কেল!

গর্জন থামবার আগেই প্রকাণ্ড একটা ট্রে উড়ে এসে পড়লো একেবারে জবার পায়ের কাছে।

নিধু এবং অপর দু'জন চাকর সিঁড়ি পার হয়ে নিরাপদ একটা জায়গায় পৌঁছে হাঁফাতে হাঁফাতে কপালের ঘাম মুছছিল।

পিসিমা বললেন : কি হল রে নিধু?

নিধু বললে : যা রোজ হয়। আমাদের হাতে খাবারের থালা দেখেই একেবারে রেগে গেলেন।

হরিধন বললে, আমাদের মাইনে চুকিয়ে দিন পিসিমা, আমরা বিদেয় হই।

—প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে আমরা এখানে কাজ করতে পারবো না, বলে উঠলো গোবর্ধন।

পিসিমা সরোজিনী স্পষ্টই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, বিশেষ এই নতুন মেয়েটির সামনে। কি করা যায় ঠিক করতে না পেরে বললেন : আচ্ছা, তোরা এখন যা, কি করা যায় দেখছি—

চাকরগুলো একে একে চলে গেল।

সরোজিনী আর একবার উপরের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, আবার কিছু পড়ে নাকি! তারপর জবাকে বললেন: কিছু মনে কোরো না মা। দাদার—মানে বড়বাবুর মেজাজটা আজ বোধ হয় ভালো নেই। তোমায় না হয় একটু পরেই নিয়ে যাব।

জবাও বড় কম বিব্রত বোধ করছিল না। সে কুণ্ঠিত ভাবে বললে, সেই ভালো। কিন্তু ওঁর মেজাজ কি প্রায়ই এরকম থাকে নাকি?

—না, মানে—ঠিক এরকম কি আর থাকে! একটা ঢোক গিললেন সরোজিনী: তবে এই কি বলে, অসুখে বিসুখে এখন একটু খিটখিটে হয়ে গেছে—

জবা আর কিছু বলবার আগেই ডাক্তার সেনকে ওইদিকে আসতে দেখা গেল। সেন এই বাড়ির গৃহচিকিৎসক। সরোজিনী হাঁফ ছেড়ে বললেন: আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ডাক্তার সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছতেই ভাঙা ডিশ্ গ্লাসগুলো ওঁর চোখে পড়লো। হাসতে হাসতে বললে, কেন যে অপেক্ষা করছিলেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বাড়িতে বাসনপত্র আর আস্ত নেই বোধ হয়। আমি ভাবছি, আমার আর এসে লাভ কি! বোধ হয় এখান থেকে সরে পড়াই ভালো।

—না, না, তা কি করে হয়! সব দিক সামলাবার চেষ্টা করেন সরোজিনী: দুনিয়ার মধ্যে আপনাকেই যা একটু খাতির করেন।

—খাতির করেন মানে মারধরটা করবার চেষ্টা করেন না, এই! তাও কোন্ দিন কি করে বসবেন কে জানে! বলতে বলতে ডাক্তার সেনের চোখ পড়লো জবার দিকে।

—এঁকে তো কই চিনতে পারলাম না?

—কাগজে যার জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, ইনিই সেই কাজের জন্যে এসেছেন। দাদাকে একটু দেখাশোনা করবেন আর বই টই পড়ে শোনাবেন।

ডাক্তার আর একবার জবার দিকে চাইলো। নিতান্তই অল্পবয়স,

মহেন্দ্রপ্রতাপের মত বদ্‌মেজাজী মানুষকে সামলানো কি এই মেয়ের কাজ! ডাক্তারের চোখে-মুখে সন্দেহটা স্পষ্টই ফুটে উঠলো।

সরোজিনী বললেনঃ কিন্তু ওকে যে দাদার ঘরে নিয়ে যেতেই সাহস হচ্ছে না!

—না হওয়াই স্বাভাবিক। উনি তো আর সার্কাসের মেয়ে নন।

—সার্কাসের মেয়ে! সরোজিনী ডাক্তারের খোঁচাটা ঠিক ধরতে পারলেন না।

—হ্যাঁ, সার্কাসে যাদের lion tamer বলে অর্থাৎ বাঘ সিংহটিংহ যারা বশ করে সেরকম মেয়ে হলে একটু সুবিধে হোতো বোধ হয়! ডাক্তার হাসতে হাসতে আর একবার চাইলো জবার দিকে, তারপর সরোজিনীকে বললেঃ তবু আসুন সঙ্গে, দেখা যাক, কপালে কি আছে।

—যাব তা হলে? বেচারী নেহাৎ ছেলেমানুষ, তাই ভাবছি। জবার দিকে চেয়ে সরোজিনী তখনও ইতস্তত করতে লাগলেন।

অভয় দিলে ডাক্তারঃ ভেবে আর লাভ কি! কি কাজটা নিতে যাচ্ছেন সেটা স্বচক্ষে দেখা তো ওঁর দরকার। চলুন—

আগে ডাক্তার, তারপর সরোজিনী, সব শেষে জবা—একে একে তিন-জনে উপরে উঠতে লাগলো।

যাঁর কাছে চাকরি করতে হবে লোকটি যে তিনি খুব সুবিধের নয় তা এরি মধ্যে জবার বোঝা হয়ে গেছে। কিন্তু যে সঙ্কল্প নিয়ে ও আশ্রম থেকে বেরিয়েছে, তাতে এইটুকুতেই হার স্বীকার করে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বড় বোকামি আর নেই! অন্তত লোকটিকে নিজের চোখে একবার দেখে যাবে জবা।

প্রকাণ্ড হলঘর। চারদিকে মূল্যবান আসবাবপত্রের ভিড়। তারি মাঝখানে এক ভদ্রলোক পিছন ফিরে বসেছিলেন। মাথায় বড় বড় চুল, রুক্ষ, এলোমেলো, একপায়ে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত পুরু ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, পাশেই একটা রূপো-বাঁধানো মোটা লাঠি।

জবা, সরোজিনী এবং ডাক্তার ঘরের দরজায় পৌছতেই, পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে তিনি গর্জন করে উঠলেন : ফের এসেছ হতভাগারা !

বোঝা গেল, ইনিই বাড়ির কর্তা মহেন্দ্রপ্রতাপ। পিসিমার পায়ে কে যেন সেইখানেই 'স্ক্রু' এঁটে দিল, জবার অবস্থাও তাই। ডাক্তার সেনই শুধু সাহস করে এগিয়ে যেতে পারলো।

পদশব্দ কাছাকাছি পৌছতে মহেন্দ্রপ্রতাপ এদিকে ফিরে তাকালেন। তারপর ডাক্তারকে দেখে অপ্রসন্নভাবে শুধু বললেন, ওঃ !

—বড় বেশী উত্তেজিত হয়েছেন দেখছি !

স্পষ্টই বোঝা গেল ডাক্তারের মন্তব্যটা সময়োপযোগী হয়নি। মহেন্দ্রপ্রতাপ পূর্ণবিক্রমে গর্জন করে উঠলেন : হ্যাঁ, হয়েছি। খুব উত্তেজিত হয়েছি। কি, হবে কি ?

—না, এত উত্তেজনা আপনার পক্ষে ভালো নয়।

—ভালো নয় ! আমার ভাল মন্দ কাউকে বুঝতে হবে না। যত খুশী আমি উত্তেজিত হব। হাজার বার হব। বলতে বলতে লাঠিটা তুলে নিয়ে সজোরে কয়েকবার ঠুকলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ, যেন শুধু মুখের কথায় মনের রাগটা পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে না ! তারপর হঠাৎ আবার চিৎকার করে উঠলেন : আর তুমি ! তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া।

—আমি !

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি। ওসব উদ্ভুটে পথ্যির ব্যবস্থা কে করেছে ? তুমিই তো ! মহেন্দ্রপ্রতাপ এবার প্রবলতর কণ্ঠে তাঁর সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিতে সুরু করলেন : তোমার ও সব ডাক্তারী হুকুম আর আমি কিন্তু শুনবো না বলে রাখছি। রোজ রোজ শুধু সাবু বার্লি, নয় ফ্যাসকানি ঝোল, নয় তো স্টু ! তাও আবার নুন নেই ! এবার আমার কাছে কেউ ওসব নিয়ে আসুক না দেখি !

বলতে বলতে এমন মুখভঙ্গী করলেন যেন সত্যিই কেউ লবণবর্জিত একবাটি ঝোল তাঁর সামনে এনে ধরেছে।

—কিন্তু ওতে আপনার ভালো হবে যে ! ডাক্তার বোঝাতে চায়।

কিন্তু বুঝবে কে! মহেন্দ্রপ্রতাপ বললেন: ভালো হয় তো তুমি খাও। গুষ্টিশুদ্ধ লোককে খাওয়াও। আমার ভালোর দরকার নেই—

উত্তেজনায় তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন, চোখ পড়ে গেল জবার দিকে। বললেন: এ আবার কে?

সাহস করে জবাকে নিয়ে দু'পা এগিয়ে এসে সরোজিনী বললেন: একেই তোমার কাজের জন্যে আনানো হয়েছে।

—না, না, আমার কাউকে দরকার নেই!

মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে মহেন্দ্রপ্রতাপ এমন মুখভঙ্গী করলেন যেন একেবারে ছেলেমানুষ! জবা ভয় পাবে না হেসে ফেলবে ঠিক করতে পারলো না।

ডাক্তার বললে: কিন্তু আপনাকে জানিয়েই তো কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা দরখাস্ত করেছিলেন তাঁদের ভেতর থেকে এঁকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। তখন নিজেই তো রাজী হয়েছিলেন আপনি।

—রাজী হয়েছিলাম! হুঁ গোছের একটা অদ্ভুত এবং অস্ফুট শব্দ করে মহেন্দ্রপ্রতাপ কিছুক্ষণ উল্টো দিকে মুখ করেই বসে রইলেন! জবার মনে হোলো, এইখানেই তার চাকরির ইতি হয়ে গেল। চলে যাবে কি না ভাবছে, মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পাটা হাত দিয়ে এদিকে ফেরাতে ফেরাতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন: তোমার—কি নাম আপনার?

—জবা।

—শুধু জবা? সুন্দরী টুন্দুরী কিছু নেই?

—না।

জবাবটা দেবার সময় ভয় ছিল জমিদার বুঝি আর একবার গর্জন করে ওঠেন। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলো না। মহেন্দ্রপ্রতাপ বললেন, আচ্ছা এখন যান্। দুটোর সময় আসবেন। ঠিক দুটোর সময়—বলেই তিনি পরম নির্বিকারভাবে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

কাজটা পাওয়া গেল কি না সেই বিষয়েই একটা খটকা রয়ে গেল। জবা সন্দিগ্ধ চোখে সরোজিনীর দিকে চাইলো। সরোজিনী সন্ত্রস্ত ভাবে তাকে

চলে আসবার ইশারা করলেন। ডাক্তারের ভাবভঙ্গীতেও তারই সমর্থন পাওয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জবা বললেঃ কিন্তু—

সরোজিনী বললেন : না, মা, এর বেশী এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করা চলবে না।

—কিন্তু, আমার তো জানা দরকার—

—আর কিছু জানবার দরকার নেই মা। দুপুরে যখন আসতে বলেছে তুমি দুর্গা বলে কাজে লেগে যাও। এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেই দক্ষযজ্ঞ সুরু হয়ে যাবে। বেলাড পেসারের রুগী, বোঝ না কেন? তার ওপর বাত আছে রীতিমত। সেদিন আবার পড়ে গিয়ে পাটা জখম করেছেন। এখন বিরক্ত করলে কি আর রক্ষে আছে?

সরোজিনী নিজের ঘরের পাশে জবার জন্যে আলাদা একটা ঘর ছেড়ে দিলেন। স্নানাহার সেরে জবা একটু বিশ্রাম করলো।

ঘুমে চোখ ভরে আসছিল, কোথায় ঘড়িতে যেন দুটো বাজলো। ধড়মড় করে উঠে পড়লো জবা। দুটোর সময় ডেকেছিলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ।

কর্তার খাসমহলে ছুটে এলো।

ঘরের মধ্যেই প্রকাণ্ড একটা শ্বেতপাথরের টেবল। বেশ মোটা সোটা বাঁধানো একখানা খাতায় মহেন্দ্রপ্রতাপ তন্ময় হয়ে কি যেন লিখছেন এবং নিজের লেখার তারিফ করে মাঝে মাঝে সমঝদারের মত মাথা নাড়ছেন।

পায়ের শব্দ হতেই অভ্যাসমতো গর্জন করে উঠলেন : কে? কে ওখানে? বলে দিয়েছি না যে দুপুর বেলায় কেউ আমায় বিরক্ত করবে না।

জবা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তবু ভালো। দুটো বেজে তিন মিনিট হয়েছে এতক্ষণে, জবা তো ভাবছিল, এই দেরীর জন্যেই বুঝি তার মাথা কাটা যায়! তবু রক্ষা—

কুণ্ঠিতভাবে জবা বললেঃ আপনি—আপনি আমায় আসতে বলে-ছিলেন।

মহেন্দ্রপ্রতাপ লাঠিতে অর্ধাঙ্গের ভার রেখে এদিকে ফিরলেন।

—ও, তুমি—মানে আপনি। এদিকে আসুন। মহেন্দ্রপ্রতাপের কণ্ঠ যেন একটু মোলায়েম শোনালো। তিনি যেন আপন মনেই বলে চললেন: হুঁ, দুটোর সময় আপনাকে আসতে বলেছিলাম—না?, কেন বলেছিলাম? কি কাজে ডেকেছিলাম?

—আজ্ঞে, তাতো কিছু বলেন নি।

—বলি নি বটে। তা—হুঁ—

মহেন্দ্রপ্রতাপ চোখ বুঁজে কি যেন ভাবতে সুরু করে দিলেন। জবা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—আচ্ছা, তুমি—মানে আপনি, বই পড়ে শোনাতে পারেন? হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠে প্রশ্ন করলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ।

জবা বললে: পারি। কিন্তু আপনি আমায় তুমিই বলবেন।

—আমি তো ছাই তুমিই বলতে চাই। তোমার মত একরত্তি মেয়েকে আপনি আপনি করা পোষায়! মহেন্দ্র খুশী হলেন কি না বোঝা গেল না, বলতে লাগলেন: কিন্তু তোমাদের আজকাল কি সব সভ্যতা-ভব্যতা হয়েছে যে! ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরলেই মেয়েদের সম্মান করতে হবে, আপনি বলতে হবে! হুঁ—

—আমাকে ওসব কিছু বলতে হবে না। আপনি আমার বাবার মতো—

অনেক ভেবে, অনেক বিচার-বিবেচনা করে কথাটা বললো জবা, ভাবলো ফল বুঝি ভালো হবে। কিন্তু নিভে-আসা-আগুন আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। মহেন্দ্র বললেন, বাবার মতো। হুঁ—বাবা কিন্তু আমি খুব ভালো নই সেটি মনে রেখ। আদর, আবদার-টাবদার আমার কাছে কিছু চলবে না। নিজের ছেলেমেয়ে সব আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে গেছে—বুঝলে। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিই না।

বলে তিনি এমনভাবে চাইলেন যেন এইটিই তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় কীর্তি।

কি বলা যায় ভাবছিল জবা, কিন্তু তার দরকার হোলো না।

মহেন্দ্র বললেন: কি? ভাবছ আমি লোকটা কি ভয়ানক! কেমন?

ঠিকই ভাবছ। আমি বড় সাংঘাতিক লোক।...তা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও; আলমারি থেকে একটা বই নিয়ে এসো।

—কি বই আনব?

—যে কোনটা আনতে পার। সবই এক বিষয়ের বই।...আচ্ছা, মাঝের তাকের প্রথম বইটা নিয়ে এসো।

জবা আলমারি খুললো। নতুন পুরাতন অজস্র বইয়ে আলমারি ভর্তি। মিথ্যে বলেন নি মহেন্দ্র, সব এক বিষয়ের বই—রান্নার। হিন্দি, ইংরিজি, বাংলা! মাঝের তাকের প্রথম বইখানার নামটিও চমৎকার: মোগলাই-খানা। বিস্ময় এবং কৌতুকের ভাবটা দমন করে জবা বইখানা নিয়ে এগিয়ে গেল মহেন্দ্রর কাছে।

মহেন্দ্র লাঠির সাহায্যে নড়ে চড়ে ভাল হয়ে বসলেন। জবাকে সামনের একটা চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর হুকুম হোলো: নাও, পড়।

—গোড়া থেকে পড়বো?

—না, যেখানে কাগজ দেওয়া আছে সেখান থেকে।

হুকুম মতো কাগজ দেওয়া জায়গাটা খুলে জবা পড়তে সুরু করলো: মাংসের বাদশাহী কাবাব। একসের ভালো রাং‌এর মাংস লইয়া—বেশীদূর এগোতে হোলো না জবাকে। এইটুকুতেই যেন মহেন্দ্রর রসনা লালাসিক্ত হয়ে উঠলো। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা যেন তিনি চেটেও নিলেন একবার। তারপর বললেন: হুঁ, লিখেছে প্রায় ঠিক, কিন্তু যে লিখেছে সে বেটা একেবারে হাড় কেপ্পন! এক সের ভাল রাং‌এর মাংস লইয়া—একসের কিরে ব্যাটা! মাংসের কি নস্যি নিবি! তার চেয়ে লিখলেই পারতিস এক ছটাক মাংস, এক ফোঁটা ঘি ঠেকাইয়া তোমার পিণ্ডি দাও। হতভাগা কোথাকার!

জবা ভাবলো, আজ দুপুরটা বোধ হয় মোগলাই খানার লেখকের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষকে গালিগালাজ করেই কাটবে, কিন্তু মহেন্দ্র হঠাৎ গলার স্বরটা নিচু করে ফেললেন। যেন ভয়ঙ্কর গোপনীয় একটা তথ্য প্রকাশ করছেন এমন ভাবে বললেন: আমি একটা বই লিখছি বুঝলে, কাউকে

এখনও বোলো না যেন—কিন্তু সে বই বেরুলে দেখো একেবারে সাড়া পড়ে যাবে—দেখে নিও—

—কি বই? উপন্যাস?

—উপন্যাস? মুহূর্তের মধ্যে মহেন্দ্রর গলার আওয়াজ উদারা থেকে তারায় পৌঁছে গেল: উপন্যাস লিখবো আমি! ওতো সব যতো আহাম্মক বকাটে ছোঁড়ারা লেখে। রামের সঙ্গে রামীর পুকুরঘাটে কি ফুটপাতে দেখা হইল, দু'জনের বুকের ভিতর কি যেন করিয়া উঠিল এবং তাহার পর তারা চুলোর দোরে গেল। আমি ওইসব লিখবো? আমি লিখছি, রান্নার বই।

সগর্বে সংবাদটি ঘোষণা করে মহেন্দ্র টেবল থেকে সেই মোটাসোটা বাঁধানো খাতাখানা তুলে নিলেন। সেটা একরকম জোর করে জবার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন: দেখো না একটু পড়ে। পড়, পড়।

খুব মুস্কিলে পড়লো জবা। বয়োবৃদ্ধ একজন লোক—দুর্দণ্ড জমিদার, যিনি লবণবর্জিত ঝোল-তরকারি খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন, নির্জন দুপুরে বসে রান্নার বই লেখেন, ভাবতেই হাসি আসছিল। এখন একেবারে সেই রান্নার বই পড়া! কিন্তু উপায় কি!

নিরুপায় জবা খাতাখানা খুলে পড়তে লাগলো:

মটনের কাশ্মীরী কোর্মা—পুরুষ্টু একটি খাসি ভেড়ার (দুম্বা হইলেই ভাল হয়) দশ সের আন্দাজ মাংস, উপযুক্ত পরিমাণ রসুন, পেঁয়াজ, আদাবাটা, হলুদ ইত্যাদি মশলাসহ দুইসের দইয়ের মধ্যে ঘণ্টা কয়েক ভিজাইয়া রাখুন—

জবা যতক্ষণ পড়ছিল মহেন্দ্র সেই অবসরে পাকা রাঁধুনীর মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে জিহ্বা সংযোগে ঠোঁট দুটোও ভিজিয়ে নিচ্ছিলেন। জবা একটু দম নিতেই বলে উঠলেন: কেমন, দেখছতো! একেই বলে রান্না!...ওই হতভাগা ডাক্তার যে আমায় মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে জব্দ করে রেখেছে, কিন্তু ওর কথা আমি আর শুনবো না। এইবলে রাখছি। ওকে কালই আমি বিদেয় করে দেব—ঠিক বিদেয় করে দেব। দেখে নিও—

পরদিন সকালে মহেন্দ্র সত্যিই ডাক্তারকে বিদায় দেবার উপক্রম করলেন। ডাক্তার মহেন্দ্র প্রতাপের হাতের উপর দিকটায় রবারের নল বেঁধে যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের চাপ পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা শেষ হতেই মহেন্দ্র বললেন: কি বলে তোমার ওই ভুতুড়ে কল?

ডাক্তার বললে: ভালো তো কিছু বলছে না। প্রেসার এখনও যথেষ্ট বেশী।

—যথেষ্ট বেশী। মহেন্দ্রপ্রতাপের গলা থেকে যেন বোমা ছিটকে পড়লো ঘরের মেঝেয়: তার মানে এখনও আমায় সাবু বার্লি খাইয়ে রাখতে চাও—!

—সাবু বার্লি না হোক, পোলাও কালিয়া খাওয়া এখন চলবে না।

—আলবৎ চলবে। লাঠিতে ভর দিয়ে উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন মহেন্দ্রপ্রতাপ: ফেলে দাও তোমার ওই চোতা কল। আজ আমি আর তোমার আবদার শুনছি না।

—না শুনলে আর কি করবো বলুন। কিন্তু তাতে আপনার দুর্ভোগই বাড়বে।

—দুর্ভোগ বাড়বে! চোখ দুটো বড় বড় করে সজোরে লাঠি ঠুকলেন মহেন্দ্র: কি ভালো ভোগেই আমায় রেখেছ! সাবু বার্লি আর স্যুপ! আজ ওসব যে আমার কাছে আনবে তাকে আমি গুলী করে মারবো। এখন তুমি বিদেয় হও দেখি ডাক্তার। বিদেয় হও, বিদেয় হও—

উত্তেজিত ভাবে হাত পা নাড়তে সুরু করায় হাতের লাঠিটা এক সময় জখম পায়ের উপর পড়লো। মহেন্দ্র একটা আর্তনাদ করে উঠলেন। ডাক্তারের সামনে তিনি শারীরিক কোন দুর্বলতাই দেখাতে নারাজ।

ডাক্তার সেন হাসতে হাসতে বললেন: আমি বিদেয় হচ্ছি। কিন্তু পাটা একটু সেরে এসেছিল, আবার বাড়বে। হয়তো কাটতেও হতে পারে। তা ছাড়া 'স্ট্রোক' যদি হয় রীতিমত ভয়ের কথা—

প্রাণপণে হাসি চেপে জবা সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভেবেছিল, কর্তা বুঝি এবার একটু ভয় খাবেন। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

—হোক ছয়ের কথা। সে আমি বুঝবো। তুমি এখন যাও দেখি, যাও—

জখম পাটায় হাত বুলোতে বুলোতে মহেন্দ্র বললেনঃ তোমাদের ডাক্তারী খুব বুঝে নিয়েছি। উপোষ করিয়ে মেরে ডাক্তারী চালাচ্ছেন। রুগীকে যে যতো বেশী উপোষ করিয়ে রাখে সে ততো বড় ডাক্তার! হুঁঃ! সেই হতভাগা ব্যাটা—আমার ছেলে সেও ডাক্তার হয়েছে কি না! রাতদিন অমনি টিকটিক করতো বলে দূর করে দিয়েছি। যাও, যাও, তুমিও যাও—

—যাচ্ছি। সেন যেতে যেতে জবাকে বললোঃ আমাকে তো উনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন, সুতরাং আমার আর কিছু করবার নেই। এখন দেখুন আপনি যদি কিছু পারেন। আজ বোধ হয় বাদশাই কি মোগলাই রান্না খাবার মতলব করেছেন। তাতে কিন্তু ভয়ানক ক্ষতি হবে।

ডাক্তার সেনের পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতেই মহেন্দ্র সগর্বে, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেনঃ কেমন যা বলেছিলাম করেছি কি না। দিয়েছি ডাক্তারকে দূর করে—

ওঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'তে লাগলো, মস্ত একটা যুদ্ধই জয় করে ফেলেছেন যেন! ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ যদি গুনগুন করে একটা গান গেয়ে ফেলেন তাতেও বুঝি আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জবা তবু সাহস করে বললোঃ উনি কিন্তু ভালো কথাই বলছেন!

—ভালো কথা শুনতে আমি চাই না। মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠলেনঃ তুমি ঠাকুরকে একবার ডাকো দেখি—

—ঠাকুরকে কেন?

—কেন, তাতে তোমার কি দরকার। ডেকে দাও ঠাকুরকে।

জবা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলো মহেন্দ্র নিজের মনেই গজ-গজ করছেনঃ হুঁঃ! আমার সব ভালো করতে এসেছেন।

জবা রান্না-বাড়িতে এসে বামুন ঠাকুরকে খবর দিলো। পিসিমা—সরোজিনীও ছিলেন সেখানে। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

—ব্যাপার কি বলতো?

—নিশ্চয়ই ইচ্ছেমতো কিছু রান্নার ফরমাস করবেন। ডাক্তারবাবুও সেই ভয় করে গেলেন।

—তা হ'লে উপায় ?

—দাঁড়ান না। ঠাকুর ফিরে আসুক। কি হুকুম করেন দেখা যাক।

ঠাকুর ফিরে আসতে ডাক্তার সেনের সন্দেহই সত্যি হলো। সত্যি একেবারে বাদসাহী ফরমাস। মাংসের গুলীকাবাব, শাদা ময়দার পরটা—গাওয়া ঘিয়ে ভাজা, ইলিশ মাছের ঝাল আর ক্ষীর এক বাটী।

—কী সর্বনেশে কথা মা! তুমি রাজী হয়ে এলে ঠাকুর ?

—না রাজী হ'লে আমায় কি আর আস্ত রাখবেন পিসিমা। বন্দুক তো হাতের কাছেই আছে সব সময়।

—কী বিপদ দেখ দেখি মা। যার নুন পর্যন্ত খাওয়া বারণ—

—নুনের কথা কি বলছেন! হুকুম হয়েছে, লঙ্কা, গরমমশলা, তেল-সরষে সব ঠিক মতো পড়া চাই—

জবা বললেঃ আপনার ওপর যা হুকুম হয়েছে আপনি তাই করুন ঠাকুরমশাই। শেষে কি চাকরিটা খোয়াবেন।

ঠাকুর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো।

সরোজিনী জবার মুখের দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেনঃ হ্যাঁ মা, শেষে তুমিও ওই পাগলের দলে ভিড়লে ?

—ভাবছেন কেন! হাসতে হাসতে বললে জবা, তারপর সেও রান্না ঘরে ঢুকলো।

মহেন্দ্রপ্রতাপের খাওয়া-দাওয়ার সময় বেলা বারোটায়। এইটেই চলে আসছে গত কয়েক বছর ধরে। সেদিন কিন্তু তিনি এগারোটার পরেই স্নান সেরে খাবার জন্যে তৈরী হয়ে টেবলে গিয়ে বসলেন এবং চাকর-বাকরদের ডেকে খাবার আনবার হুকুম দিলেন। গোবর্ধন ছুটতে ছুটতে বামুন ঠাকুরকে গিয়ে খবর দিলো। ফরমাস মতো সব রান্না শেষ তখনও হয় নি। ঠাকুরের মুখ শুকিয়ে গেল। ইলিশের ঝালটাই তখনও বাকি।

জবা অভয় দিলে : যা হয়েছে তাই নিয়ে যাও, পরের ব্যবস্থা আমরা করছি—

ঠাকুর মাংসের গুলীকাবাব, গরম খান কয়েক পরটা ট্রেতে সাজিয়ে গোবর্ধনের হাতে দিলো। ঝাল হয়ে উঠেনি, ভাজা ইলিশই দেওয়া হোলো আলাদা একটা প্লেটে। ক্ষীরও রইলো এক বাটী।

ট্রে হাতে গোবর্ধনকে প্রবেশ করতে দেখে মহেন্দ্র লালায়িত হয়ে উঠলেন। যাক, জবা মেয়েটা যে সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়নি, এই রক্ষে। ধবধবে একখানা তোয়ালে কোলের উপর বিছিয়ে মহেন্দ্র কাচের পাত্রগুলির ঢাকা খুলতে লাগলেন। চোখে-মুখে যেন জিঘাংসার ভাব।

মাংসের গুলীকাবাব আজ প্রায় বছর খানেক—

মহেন্দ্র বড় একটা চামচে করে কাবাবের খানিকটা ঝোল লালাসিক্ত মুখগহ্বরে চালান করে দেবার উপক্রম করছেন, পিছন থেকে জবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল : দাঁড়ান, খাবেন না।

মহেন্দ্র সবিস্ময়ে চোখ মেলে চাইতেই দেখা গেল জবা নিজে একটা ট্রেতে আরও কয়েকটা প্লেট ও বাটী নিয়ে ঘরে ঢুকছে। পিছনে সরোজিনী।

জবা টেবলের কাছে এসে গোবর্ধনকে হুকুম করলো : এ সব এখান থেকে নিয়ে যাও—

ঘরের 'সিলিংটা' হঠাৎ খসে পড়লেও মহেন্দ্র বুঝি এতোটা আশ্চর্য হতেন না। তাঁর মুখের গ্রাস সরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম দেয়, এত বড় দুঃসাহস এই পুঁচকে এতটুকু মেয়েটার!

—নিয়ে যাবে মানে! চামচটা ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে গর্জন করে উঠলেন।

—হ্যাঁ, ওসব আপনার খাওয়া চলবে না। জবা বেশ ধীর, স্থির ভাবেই জবাব দেয়।

—চলবে না!

মহেন্দ্রর মনে হলো, এটা তাঁর বাড়ি নয়, তিনি মহেন্দ্রপ্রতাপ ন'ন, তা নইলে—

জবা তেমনি ধীরভাবে বললে : না ; চলবে না।

গোবর্ধন পর্যন্ত তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এমন অসম্ভব কাণ্ড সে এবাড়িতে আগে কখনও দেখেনি। জবা গুলীকাবাব ও অন্যান্য পাত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেও একপাশে দাঁড়িয়ে সে শুধু এই আজব ব্যাপার হাঁ করে দেখে যাচ্ছিলো। হাত বাড়াবার সাহস করেনি।

জবা আবার বললে : যাও, নিয়ে যাও।

গোবর্ধন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াতেই মহেন্দ্র চিৎকার করে উঠলেন : খবরদার বলছি, হাত দিলে গুলী করে মারব !

গোবর্ধন আর সেখানে দাঁড়ানো যুক্তিযুক্ত মনে করলো না।

জবা এগিয়ে এসে হাতের প্লেটগুলো টেবলে রাখলো এবং নিজেই আগেকার প্লেট প্রভৃতি সরিয়ে নিয়ে সরোজিনীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললো, তাই, গুলী করেই আমাদের মারুন, তবু আপনিতো বাঁচবেন—

অসহ্য রাগে মহেন্দ্রর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যাচ্ছিল। তিনি শুধু বলতে পারলেন : তুমি !······তোমার এতো বড়ো আস্পর্দা !

—হ্যাঁ, আমার এতো বড়ো আস্পর্দা, নতুন পাত্রগুলির ঢাকা খুলে মহেন্দ্রর সামনে সাজাতে সাজাতে জবা বললো : আপনাকে দেখাশুনোর ভার যতোক্ষণ আমার ওপর আছে ততোক্ষণ আমার কর্তব্য আমি করে যাবো।

এবার মহেন্দ্রর সামনে রাখা হোলো, একটি প্লেটে কয়েকটুকরো পেঁপে এবং ঢেঁড়স সিদ্ধ, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, শুকনো রুটী গোটা দুই, একবাটী ঝোল—পাতলা জলের মত, কচি মাছের একটা টুকরো সমেত। সঙ্গে পাতিলেবু দু'ফালি। আর একগ্লাস ঘোল।

মহেন্দ্র নিঃশব্দ বিস্ময়ে পরিবর্তনটা লক্ষ্য করছিলেন।

মাংসের গুলীকাবাব আর ইলিশের ঝালের বদলে—

জবা বললে : নিন, যা দিচ্ছি তাই খান।

—যা দিচ্ছি তাই খাবো! তোমার ইচ্ছেমতো আমায় খেতে হবে!

—হ্যাঁ হবে। আপনার জুলুম-জবরদস্তি সবাই ভয়ে ভয়ে মেনে নেয়। আপনার নিজের ছেলেমেয়েরা ভয়ে আপনার কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু নিজের ভালোর জন্যে আপনাকে এখন শাসন করা দরকার।

—শাসন করা দরকার! আমায়? মহেন্দ্র যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। খানিক স্তম্ভিত থেকে সরোজিনীর দিকে চেয়ে বললেন: এ বলে কি সরো?

সরোজিনী এতোক্ষণ জবার অসম সাহসিক কাণ্ড দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিলেন, এবার গম্ভীর হয়ে বললেন: কই, আমি তো কিছু জানি না।

—না, তুমি ন্যাকা, তুমি কিছু জানো না! ভেংচে উঠলেন মহেন্দ্র। রাগে জ্বলে যাচ্ছে সর্বশরীর, মাথার মধ্যে শিরা-উপশিরাগুলো যেন দাপাদাপি করছে, অথচ কিছু করতে পারছেন না, এমন অদ্ভুত বেকায়দায় মহেন্দ্র বুঝি জীবনে এই প্রথম পড়লেন।

হঠাৎ টেবলে একটা ঘুঁষি মেরে বলে উঠলেন: অসম্ভব। আমি কিন্তু—

—মিছে চেঁচামেচি করবেন না। জবা বেশ সংযত, দৃঢ় কণ্ঠেই বলে চললো: ব্লাডপ্রেসার বেশী থাকলে চেঁচামেচি খারাপ। এখন ভালো মানুষের মতো যা দিয়েছি তাই খাবেন কি না বলুন?

—যদি না খাই করবে কি? মহেন্দ্রর কণ্ঠস্বরটা জোরালো, কিন্তু কোথায় যেন একটা অসহায় ভাব।

—কি আর করবো! জবা জানালো: আমার দ্বারা আপনার ভার নেওয়া হবে না বুঝে এখান থেকে চলে যাবো।

—চলে যাবে! মহেন্দ্র বেশ চড়া পর্দাতেই আরম্ভ করলেন, কিন্তু শেষের দিকে স্বরটা যেন নেমে গেল: ওঃ! চলে যাবো বলে আমায় ভয় দেখানো হচ্ছে! আমি যেন কাউকে ভয় করি! হাঃ—

বলতে বলতেই কখন একটা ঢেঁড়স সিদ্ধ নিয়ে মুখে দিলেন, নিজেই বুঝি টের পেলেন না।

জবা এবং সরোজিনী দুজনেই চোখে চোখে চাইলো একবার, দুজনের মুখেই হাসি। সে হাসিটা বোধ হয় মহেন্দ্রর চোখে পড়ে গেল, তিনি যেন তার ভ্রষ্ট মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবার জন্যেই আর একবার চেঁচিয়ে উঠলেন: আমি কিন্তু এবার সব ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেব। সবাইকে—আমার কাউকে দরকার নেই—

—আজ তা হ'লে আর দুপুরবেলা বই পড়ে শোনাতে হবে না? দুষ্টুমিভরা চোখে জবা এবার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো।

কাজ হোলো তাতে। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি একটুকরো সিদ্ধ পেঁপে মুখে ফেলে জবাব দিলেন: হবে না, আমি বলেছি!

সরোজিনীর কাছে সব কথা শুনে জবা এই খামখেয়ালী বদমেজাজ লোকটির সম্বন্ধে মনে মনে একটা ধারণা করে নিয়েছিল। এবাড়িতে সবাই তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী, আশ্রিত; কাজেই কেউ তাঁকে চটাতে সাহস করে না। ফলে তাঁর মেজাজের মাত্রাটা বেড়েই চলেছে। আন্তরিক স্নেহ যত্ন করবার লোক নেই, ভয়ে ভয়ে সবাই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। জবাও তাঁরই আশ্রয়ে পড়েছে এসে সত্যি, কিন্তু দরকার মতো একটু শক্ত হয়ে দেখতে ক্ষতি কি? চাকরিতে জবাব হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন অনর্থ ঘটবে না নিশ্চয়ই। দুদিন আগেও তার এ চাকরির ভরসা ছিল না, আবার না হয়—! সুতরাং দেখাই যাক না লোকটাকে একটু শাসন আর সেই সঙ্গে স্নেহ-যত্ন করে।

আজ যা ঘটলো সেটাকে মোটামুটি আশাপ্রদই বলতে হবে। মহেন্দ্রকে খাইয়ে দাইয়ে জবা খুশীমনে নিচে নেমে এলো সরোজিনীর সঙ্গে—

নামতে নামতে সরোজিনী বললেন: ধন্যি মা তোমার বুকের পাটা! বুড়ো হয়ে মরতে চললুম, এখনও দাদার সামনে চোখ তুলে চাইতে পারি না—

জবা হাসতে হাসতে স্নান করতে গেল।

দিন দুই পরে।

দুপুরে বই পড়ে শোনাতে এসে জবা দেখে, লাঠি ছেড়ে মহেন্দ্র দেয়ালে

হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চলবার চেষ্টা করছেন। খোঁড়ানোর ভাবটাও যেন কম।

জবার দিকে চোখ পড়তেই একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেনঃ এই একটু হেঁটে দেখছিলাম। পাটায় আজ খুব জোর পাচ্ছি—বুঝলে, দস্তুরমতো জোর পাচ্ছি। ব্যথাটা টেরই পাচ্ছি না।

জবা হাসতে হাসতে জবাব দেয়ঃ একটু সাবধানে চললে আর নিয়ম মতো খাওয়া-দাওয়া করলেই আপনি সেরে উঠবেন।

—হুঁঃ! নিয়মমতো খাওয়া-দাওয়া, শুধু নিয়মমতো খাওয়া-দাওয়া! ভারি সব নিয়ম শিখেছেন!

উপদেশ জিনিসটা মহেন্দ্রর মোটেই বরদাস্ত হয় না। তিনি হঠাৎ বললেনঃ কই, বই কোথায়? বই নিয়ে এসেছ?

—না, আজ কি বই পড়বো?

—হুঁঃ, কি পড়বে বল দেখি?

—রামায়ণ কি গীতা····ধর্মের কোন বইটই—

—উহুঁ, উহুঁ—মহেন্দ্রর মেজাজ বিগড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যেঃ ওসব ধম্ম-টম্মর নামও কোরো না আমার কাছে। ধম্ম! ধম্ম মানে তো যতো ঠাকুর-দেবতার খোশামুদি! খোশামুদি আমি কারো কখনো করি না, তা সে মানুষই কি আর দেবতাই কি! ও সব ধম্মটম্ম আমার সয় না।

—তা হ'লে কি বই পড়বো?

—কি পড়বে? কেন, ওই রান্নার বইই পড়ো। সেলফে খুব ভালো বই আছে। সব রান্নার বই। দিশি, বিলিতি, চীনে, জাপানী সবরকম রান্নার বই আমি জোগাড় করেছি। নিয়ে এসো একখানা—

জবা শেল্ফ থেকে একখানা বই এনে পড়তে বসলো চেয়ারটা টেনে। মহেন্দ্রও এসে বসলেন নিজের চেয়ারটিতে। জবা পড়তে লাগলো। কাশ্মীরী পোলাওয়ের পাক-প্রণালী। কতখানি মাংসের সঙ্গে কতখানি জাফরাণ আর ক্ষীর···

কিন্তু কাশ্মীরী পোলাওয়ের এই চমৎকার রন্ধন প্রণালী ছেড়ে মহেন্দ্র-

প্রতাপ তখন চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন জবার দিকে। হঠাৎ চোখ পড়ে গিয়েছিল। ক'দিনই রয়েছে এখানে, আসছে, কথা কইছে, খাইয়ে-দাইয়ে সেবাযত্ন করছে, বই পড়ছে ভালো—কিন্তু চোখে পড়ার মতো করে দেখলেন বুঝি এই প্রথম।

হঠাৎ বলে উঠলেন : তা চেহারাটা তো বেশ মিষ্টি। কিন্তু একজোড়া ঠুলি এঁটে হতকুচ্ছিৎ করে রেখেছো কেন? এই বয়সেই চোখের মাথা খেয়েছো নাকি?

চমকে উঠলো জবা। চশমায় কি দোষ হোলো?

কিছু বলবার আগেই মহেন্দ্র হুকুম করলেন : খোলো, খোলো, চশমাটা খোলো—

জবা চশমাটা খুলে টেবলে রাখতেই মহেন্দ্র হাতে করে তুলে নিলেন। চোখে দিয়ে দেখলেন একবার। তারপর বললেন : অ্যাঁ! এতো শুধু কাচ দেখছি! না, না, এসব পরাটরা চলবে না—

বয়স একটু বেশী দেখাবে ভেবে জবা এই চশমা জোড়াটা কিনেছিল আশ্রম থেকে আসবার দিনই। এখানে এসে চুল বাঁধতো খুব আঁটসাট, সাধাসিধে করে। সেদিকেও আজ মহেন্দ্রর চোখ পড়ে গেল।

জবা আবার কাশ্মীরী পোলাওয়ের পাতায় মন দেবার চেষ্টা করছিল, মহেন্দ্র বলে উঠলেন : আর শোনো। ওই শাঁকচুন্নির মতো ঝুটিকরে চুল বাঁধাও চলবে না। একরত্তি মেয়ে, তোমার এতো ভিরকুটি কিসের? এই তো তোমাদের সাজবার বয়স। ভাল করে সাজগোছ করবে। আমি ওইসব দুঃখিনী বেশটেশ মোটে পছন্দ করি না, দুচক্ষে দেখতে পারি না, বুঝলে—?

জবা মিষ্টি হেসে ঘাড় নাড়লো : আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহেন্দ্র বললেন : ব্যস্। এইবার পড়ো—

আরো কয়েকটা দিন কাটলো এ বাড়িতে।

বৈচিত্র্য নেই এমন কিছু। সকালে উঠে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো,

দুপুরে খাবারের 'মেনু' নিয়ে মনিবের সঙ্গে খানিকটা কথা কাটাকাটি, বই পড়ে শোনানো। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আর এক প্রস্থ হৈ চৈ, বাকি সময়টুকু পিসিমার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব, নয়তো বসে বসে চুপচাপ ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবা। কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যেই এ বাড়ির বদমেজাজী, খাপছাড়া এই কর্তা ব্যক্তিটিকে যেন একটু একটু করে বুঝতে পারা যায়। আগে লোকটির কাছে যেতে ভয় পেত। সে ভাবটা কেটে গেছে বললেই হয়। ভয়ের বদলে এখন হাসি পায় মহেন্দ্রপ্রতাপের হাঁক-ডাক, তর্জন-গর্জন শুনলে। মনে হয়, লোকটি যেন সত্যি খুব রূঢ় প্রকৃতির নয়, কোথায় যেন একটি স্নেহাতুর মানুষ লুকিয়ে আছে বাইরের এই কঠিন চেহারা আর কর্কশ, কটু ভাষণের অন্তরালে। কে জানে কি! হয়তো ভুল করছে জবা। এই ক'দিনে একটা মানুষকে কি সত্যি বোঝা যায়?

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিলো জবা।

বাড়ির পিছন দিকের রাস্তাটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

বুড়োমতোন একটা লোক মাথায় ফেট্টি বেঁধে গান গাইতে গাইতে আসছে। পেছনে একদল ছেলে মেয়ে। কেউ কাপড় ধরে টানছে, কেউ জামার পকেটে হাত চালিয়ে দিচ্ছে। যেন অনেক দিনের চেনা লোক।

আর একটু কাছাকাছি আসতেই গানের কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেল।

খাঁচায় ধরে তারে রাখতে পারি কই!
সে তো নয় পোষা ময়না!

আরে, এটা তো সাধনদার গান। এ গান ও শিখলো কি করে?

সাধনদাই নয়তো?

কী আশ্চর্য! সাধনদাই তো—কেবল আর একটু বুড়ো আর রোগা হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে চিনতে পারে নি জবা।

হারাধন যাচ্ছিল বারান্দা দিয়ে। জবা ছুটে গিয়ে ধরলো তাকে।

—বাইরের রাস্তায় কে গান গাইছে, তাকে একবার ডেকে আনোনা গোবর্ধন।

—এখানে ডেকে আনবো কেন? দুটো পয়সা আননা, দিয়ে আসি—

—না, না, ওকেই দরকার। তুমি ডেকে নিয়ে এসো এক্ষুনি—

হারাধন একটু অবাক হয়ে নিচে নেমে গেল।

পিছনের দরজা দিয়ে সাধনকে নিয়ে ফিরে আসতে খুব সময় লাগলো না গোবর্ধনের।

হঠাৎ জমিদার বাড়ির মধ্যে ডাক! ব্যাপার কিছু বুঝতে পারে নি সাধন। ভেবেছিল বাবুদের গান শোনার শখ হয়েছে। কিন্তু উপরে এসে জবাকে তারি অপেক্ষায় সাগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনন্দে, বিস্ময়ে একেবারে হত চকিত হয়ে গেল।

—চিনতে পারছো না সাধনদা?

কাছে এসে হাসিমুখে চাইলো জবা।

—জবা দিদি! তুমি এখানে!

—হ্যাঁ সাধনদা, আজকাল এইখানেই কাজ করি যে—

—খুব ভালো দিদিমণি, খুব ভালো! উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সাধন: দিনের মধ্যে কতো বার যে তোমার কথা ভাবি, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই—

—আমারও সাধনদা! জবা বলে সঙ্গে সঙ্গে: আশ্রমে থাকতে স্নেহ ভালবাসা কাকে বলে সে তো শুধু তোমার আর নলিনীদির কাছেই জেনেছি। কিন্তু তুমি কি আজকাল রাস্তায় রাস্তায় এমনি গান গেয়ে বেড়াও নাকি?

—আশ্রমের কাজ যাবার পর এই করেই চালাই! বরাবরের মতন নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো সাধন: তা বেশ চলে যায় দিদিমণি। দিব্যি চলে যায়! আমার কোন দুঃখু নেই।

—কোন্ দুঃখই বা কবে তুমি গায়ে মেখেছো!

অনাত্মীয় এই মানুষটির প্রতি করুণায় ভরে ওঠে জবা।

হঠাৎ ওদিক থেকে পিসিমার গলা শোনা গেল: জবা, ও জবা, এদিকে একবার এসো মা, দেখ দেখি কী কাণ্ড!

সাধন বিব্রত হয়ে ওঠে।

—আমি এখন যাই দিদিমণি। তোমার কাজ আছে—

—মাঝে মাঝে এসো কিন্তু সাধনদা। তোমায় দেখলে তবু—

গলাটা ধরে আসে জবার।

সাধন তাড়াতাড়ি বলে ঃ আসবো দিদিমণি, নিশ্চয় আসবো। একবার যখন সন্ধান পেয়েছি তখন না বল্লেও এসে বিরক্ত করবো।

হাসতে হাসতে নিচে নামে সাধন। হারাধনই সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

সে দিন রাত্রে সে এক কাণ্ড! খেতে বসে মহেন্দ্রপ্রতাপ একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসলেন।

পাঠান আমলে বাঙালীর খাওয়া-দাওয়ার ঘটা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ—জবাকে সেগুলোর 'নোট' রাখতে হচ্ছিল। এসম্বন্ধে আলাদা একখানা বই লিখবেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। হারাধন এবং আরও ক'জন ভৃত্য মিলে কর্তাবাবুর নৈশ আহার নিয়ে হাজির হোলো। টেবল পেতে কাঁটা-চামচ, প্লেট প্রভৃতি সাজাতে লাগলো হারাধন। সব ক'জনেরই বেশ একটু সন্ত্রস্ত ভাব। ওদের দেখলেই মনে হয়, মহেন্দ্রর ধমক অথবা মার খাওয়ার ভয়ে ওরা সব সময় তটস্থ হয়ে আছে। মহেন্দ্র চুপ করে ওদের কার্যকলাপ দেখছিলেন—বোধকরি, আজকের আহার্যবস্তুর পদগুলি ঠিক কি জাতীয় মনে মনে তাই অনুমানের চেষ্টা করছিলেন। লাঠিগাছটায় হাত দিলেন একবার—বোধহয় উঠে দাঁড়াবার জন্যে, হারাধন, বিধু প্রভৃতির হাত কাঁপতে লাগলো—আর দু'জন বেশ খানিকটা দূরে সরে গেল। কে জানে, লাঠি বুঝি পিঠেই পড়ে !…কিন্তু, না সে রকম কিছু ঘটলো না। ওরা সাহস করে আবার টেবলের কাছে এগিয়ে এলো।

—কি এনেছো ছাইপাঁশ? জিজ্ঞাসা করলেন মহেন্দ্র।

—আজ্ঞে,—ঘর্মাক্ত অবস্থায় ঢোক গিললো হারাধন।

—খুব তো ঢাকাঢুকি দিয়ে আনা হয়েছে! বলি কী আছে এতে?

হারাধনরা এ-ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলো। কি আছে বলতে গিয়ে কি শেষে চাকরিটাই নষ্ট করবে—!

জবা এতক্ষণ মুখ বুঁজে দুই তরফের কাণ্ড কারখানা দেখছিলো। কিন্তু

চুপ করে থাকা চললো না। বললে : যা আছে এখুনি দেখতে পাবেন। তোমরা যাও—

হারাধনের দল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রায় ছুটতে ছুটতে পালালো।

মহেন্দ্রপ্রতাপ তখনও লাঠির ওপর ভর দিয়ে টেবলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। মুখখানা গম্ভীর, থমথমে।

টেবলটা ওঁর দিকে আর একটু সরিয়ে এনে জবা বললে : নিন, খেতে বসুন।

—না।

—না মানে ? খেতে বসবেন না ?

—না। ওতে কি আছে না জেনে নয়।

বড় পাত্রটার ঢাকা খুলতে খুলতে জবা বললে : এই তো মাংসের স্টু আর স্যালাড—

—স্টু আর স্যালাড ! মহেন্দ্রর মুখ-চোখ হিংস্র হয়ে উঠলো : আমি কি গরু-ছাগল যে রোজ রোজ শুধু কাঁচা ঘাস-পাতার জাবনা গিলবো ! আমার শরীর এখন ভালো হয়ে গেছে।

—ভালো হয়ে গেলেই হবে না, ভালো রাখতে হবে। হাসি চাপতে চাপতে বললে জবা : স্টু আর স্যালাড কি জাবনা হোলো ? শরীরে যা সয় তাই তো খেতে হবে।

—শরীরে যা সয় ! মহেন্দ্র সশব্দে লাঠিটা ঠুকলেন একবার : আমার শরীরে কি সয় আমার চেয়ে তোমরা ভালো বোঝ—! আমি লোহা খেয়ে হজম করেছি তা জানো ! একটা গোটা খাসি একলা খেয়েছি !

বলে এমন ভাবে চাইলেন যেন, নিতান্ত বাঙালী মেয়ে না হয়ে জবা যদি ওই জাতীয় কিছু হতো তা হলে মহেন্দ্র বোধহয় তাকেও উদরস্থ করে ফেলতেন !

জবা কিন্তু ভয় পেলো না। হাসতে হাসতে বললে : সে যখন খেয়েছেন তখন রক্তের জোর ছিল। আর ঐরকম যাতা খেয়েইতো এখন এতো ভুগছেন।

—ওঃ, যাতা খেয়েই আমি ভুগছি! মহেন্দ্র খেঁকিয়ে উঠলেন: আমার এখন রক্তের জোর নেই! কই কোথাকার কে জোয়ানমদ্দ আছে নিয়ে এসো দেখি, লড়ে যাক আমার সঙ্গে একহাত। রীতিমতো ওস্তাদ রেখে কুস্তি শিখেছিলাম, তা জান? এক ধোবিপাট দিয়ে একেবারে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে ছেড়ে দোব!

বলতে বলতে যৌবনকালের কোন কুস্তির আখড়ার এই 'ধোবিপাট' জাতীয় কোন প্যাঁচের কথাই বোধ হয় তাঁর মনে পড়ে গেল। হাত পা নেড়ে—স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে তিনি এমন উগ্র একটা ভঙ্গি করলেন: যে, তাঁর জখম পায়ের কথাও তাঁর মনে রইলোনা। চোট লাগলো সেই পা'টাতেই।

—উঁহুহু, গেছিরে, বলে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। কিন্তু তখনই মনে পড়লো জবা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে খাটে গিয়ে বসলেন। ওঁর দুরাবস্থা দেখে করুণা হোলো জবার। হাসিও পেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে: আচ্ছা, এবার খেয়ে নিন তো।

—খেয়ে নোব! তোমার হুকুমে খেয়ে নোব—আবার গর্জন করে উঠলেন মহেন্দ্র।

—চিরকাল তো হুকুম করেই এসেছেন। এখন না হয় আমার হুকুম একটু শুনলেন।

মহেন্দ্র চুপ করে কি যেন ভাবলেন একটু। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে খাবার টেবলে গিয়ে বসলেন। কাঁটা চামচে তুলে নিয়ে নিজের মনেই গজগজ করতে লাগলেন: কালকের একরত্তি মেয়ে ওঁর হুকুম আমায় শুনতে হবে! যতো কিছু বলিনা আবাগীর বেটীর আস্পর্ধা ততো দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

রীতিমতো অপমানিত বোধ করলো জবা। প্রায় চিৎকার করে বললো: কী বললেন?

হঠাৎ মুখ দিয়ে এতোবড়ো একটা কঠিন কথা বেরিয়ে যাওয়ায় মহেন্দ্র নিজেই মনে মনে যথেষ্ট বিব্রত এবং লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু

এতোটুকু একটা মেয়ের কাছে ত্রুটি স্বীকার করতে তাঁর অহঙ্কারে বাধলো। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই তিনি জবাব দিলেন: কখন আবার কি বললাম? আমি তো খেতে বসেছি।

বলেই স্টুএর পাত্রটায় চামচ ডুবিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে স্থরু করলেন এবং আবার বেশ জোর গলায় বললেন: কিছু আমি বলিনি।

—হ্যাঁ বলেছেন। আর কি বলেছেন তা আপনি ভালো করেই জানেন।

চোখে জল এসে পড়েছিলো জবার। লোকটি যতো দুর্ব্যবহারই করুক এমন কঠিন কথা সে যেন তার কাছে আশা করেনি। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

—বলি যাচ্ছো কোথায়? জানো না খাবার সময় কেউ কাছে না থাকলে আমি খেতে পারি না।

মহেন্দ্রপ্রতাপ একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করে জবাকে আটকাবার এবং নিজের দুশ্চিন্তাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন।

—আমার পক্ষে এখানে থাকা আর সম্ভব নয়।

কোনরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে, বেশ স্থিরভাবেই বললো জবা।

—সম্ভব নয়! এমন কি কথা আমি বলেছি যে তোমায় চলে যেতেই হবে?

মহেন্দ্রর চোখের দৃষ্টি এবার রীতিমতো অসহায় মনে হলো। জবার তরফ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

মহেন্দ্র বললেন: তা একেবারেই যাচ্ছো বোধ হয়?

—হ্যাঁ, একেবারেই যাচ্ছি।

জবা আর সেখানে দাঁড়ানো প্রয়োজন মনে করলো না। মহেন্দ্র কিছুক্ষণের মতো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! বলে কি মেয়েটা? একেবারে মুখের ওপর স্পষ্ট জবাব! ভয় নেই, ভাবনা নেই—ভবিষ্যতের চিন্তা পর্যন্ত নেই!

—যেও না, দাঁড়াও—দাঁড়াও বলছি।

মহেন্দ্র শেষ চেষ্টা করলেন মেয়েটাকে ফেরাবার।

কিন্তু জবা ততোক্ষণে সিঁড়ি পার হয়ে পিসিমার ঘরে এসে পৌছেচে।

খাওয়া অসমাপ্ত রেখে মহেন্দ্র লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

জবার মুখের দিকে চেয়েই পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে রে জবা? কী হয়েছে?

—কিছু হয়নি পিসিমা, আমি চলে যাচ্ছি।

জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেবার জন্যে জবা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলো। পিছন থেকে মহেন্দ্রপ্রতাপের গর্জন শোনা গেল: হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি! চলে অমনি গেলেই হল!

লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন মহেন্দ্র। জবা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলো। মহেন্দ্র সেইখান থেকেই বললেন: দাঁড়াও—

জবা আর এগোতে পারলোনা।

—খুব তো তেজ করে চলে যাওয়া হচ্ছে! অন্তত একমাসের নোটিশ না দিয়ে যাওয়া যায় না তা জান? রীতিমতো আইনজ্ঞের মতো হুমকী দিলেন মহেন্দ্র: একটি পয়সা মাইনে আমি দেবো না।

—মাইনে আমি চাই না। জবার আহত আত্মসম্মান আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

—ওঃ! মাইনে চাও না! মহেন্দ্র বলে উঠলেন: তা এতোই যদি বড় মানুষ তো কাজ করতে এসেছিলে কেন?

—অন্যায় হয়েছিল আসা। এরকম অপমান হতে হবে জানলে কখনো আসতাম না।

—অপমান! তুমি অপমান হয়েছো? মহেন্দ্র যেন আকাশ থেকে পড়লেন: কি অপমান আমি করেছি শুনি? তুই বুঝে দেখ সরো, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে রোজ জুলুম করে, তাই বলেছি আবাগীর বেটীর আস্পর্ধা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে—তা এতেই—

সমর্থনের জন্যে ভগ্নীর দিকে চাইলেন মহেন্দ্র। কিন্তু তাঁর কাছে সমর্থন তো মিললোই না, তিনি মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে শুধু বললেন: ছিঃ দাদা—

ঘাবড়ে গেলেন মহেন্দ্র মুহূর্তের জন্যে। তাই তো, ব্যাপারটা কি তা হ'লে সত্যি·········

এতোক্ষণে যেন কতকটা বুঝতে পারলেন।

—ওঃ! বেটী বলা অন্যায় হয়েছে! আবাগীর বেটী তোমাদের কাছে অসভ্য কথা! তোমরা এখন বড়ো সভ্য হয়েছো! আরে হতচ্ছাড়ীরা, আমাদের সময় আবাগীর বেটী আদরের ডাক ছিলো।······তা বেশ, ওকথা বলবো না আর। এখন থেকে জবাদেবী বলে ডাকবো।

—কিছু বলেই ডাকবার দরকার হবে না। আমি সত্যি চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছো? তবু চলে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ, যে কাজের জন্যে আমায় রাখা, তাই যদি আমায় দিয়ে না হয় তো আমার থেকে লাভ কি! আপনি তো কোন কথাই শোনেন না। ভালো কথা আপনার কাছে জুলুম বলে মনে হয়। আমি আর কি করতে থাকবো!

—বেশ যাও, চলেই যাও। আমি বাঁচি তা'হলে। দেখি কে এখন আমায় আটকায়! যা খুশী তাই আমি এখন খাবো।

খুব বীরত্বব্যঞ্জক ভাবেই বললেন কথাগুলো, কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসহায়, ছেলেমানুষী ভাব প্রকাশ পেলো। পরমুহূর্তেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন: ঠাকুর! ঠাকুর!

মনে মনে জগন্নাথ দেবকে স্মরণ করতে করতে সন্ত্রস্ত ঠাকুর ছুটতে ছুটতে সিঁড়ির কাছে পৌঁছলো।

মহেন্দ্রপ্রতাপ লাঠিটা সশব্দে ঠুকতে ঠুকতে হুকুম দিলেন: আজ কাশ্মীরী পোলাও রাঁধবে, আর, মটন দো-পেঁয়াজী—আর, আর—হ্যাঁ, পাকা রুইয়ের রোগান জুস—

—যে আজ্ঞে—চাকরি যায় নি, এতেই খুশী হয়ে ঠাকুর যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

মহেন্দ্র বললেন: ভুল হয় না যেন।

ঠাকুর ছুটতে ছুটতেই ঘাড় নাড়লো। মহেন্দ্র জবা আর সরোজিনী

দু'জনের দিকে কটমট করে চাইলেন একবার। তারপর হঠাৎ দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঁচু করে, চেঁচিয়ে উঠলেন : হুঁঃ! আমার বড়ো বয়েই গেলো।

শেষবারের মতো একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লাঠির অনাবশ্যক শব্দ করতে করতে মহেন্দ্র উপরে উঠে গেলেন। একা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। তার জন্যে চাকর-বাকর বা জবার সাহায্য নিতে হয়। আজ কিন্তু তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজেই উঠে গেলেন।

জবা চেয়ে চেয়ে তার ভাবভঙ্গী দেখছিলো। মহেন্দ্র সিঁড়ি পার হয়ে নিজের ঘরে ঢুকতেই সে হেসে ফেললো। এতো তর্জন গর্জন! কিন্তু সবই যেন একেবারে ছেলেমানুষের মতো। এর ওপর রাগ করে থাকা যায় কতোক্ষণ? সরোজিনীর দিকে চেয়ে জবা বললেন : শুনলেন তো! আমি কি করবো বলতে পারেন পিসিমা?

—কি আর করবে মা! হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন সরোজিনী : মনে করো তোমার এক কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। ছোট ছেলের মতোই তো অবুঝ—

—কিন্তু এদিকে আবার হাঁকডাক যে বুড়ো বাঘের মতো!

—তবু তোমার শাসনই যা একটু মানেন। তুমি চলে গেলে কে ওকে সামলাবে!

—কিন্তু আমারও যে মাঝে মাঝে রাগ ধরে যায়!

নিধুঠাকুর কখন ফিরে এসে সেইখানে দাঁড়িয়েছে। রোগান জুস আর মটন দোপেঁয়াজীর উপকরণ এতো রাত্রে কি করে সংগ্রহ করবে, আদৌ করবে কি না তার একটা পরামর্শ দরকার। ওর দিকে চোখ পড়তেই জবা বললে : তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

—আজ্ঞে, বড়বাবু যে হুকুম দিয়ে গেলেন—

—সে হুকুম চলবে না।

—আজ্ঞে, আমার গর্দান কি তা হ'লে—

—তোমার গর্দান আমি নতুন করে গড়িয়ে দেবো।

হাসতে হাসতে জবা উপরে উঠতে লাগলো। ঠাকুর নিশ্চিন্ত হয়ে

রসুই ঘরের দিকে পা বাড়ালো। জবা দিদিমণি যখন নিজে উপরে যাচ্ছেন, এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। সাহস আছে মেয়েটার। খুব বশ করেছে বড়বাবুকে!

দিন কয়েকের মধ্যে ভাগ্যবিড়ম্বিতা, সহায় সম্বলহীনা একটি মেয়ের সঙ্গে এবাড়ির দোর্দণ্ডপ্রতাপ মালিকের সম্পর্কটা রীতিমত আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়ে উঠলো। মহেন্দ্রপ্রতাপ এখনও খাবার সময় হাঁক-ডাক, হম্বি-তম্বি করেন, কিন্তু তার আগের সেই উগ্র বিস্ফোরকের সেই ভাবটা যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। নিধিরাম কিংবা বিধুকে সামনে পেলে চেঁচামেচির কসুর করেন না, সরোজিনীরও রেহাই নেই, কিন্তু জবা সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই একেবারে অন্য রকম। আগে তো দিবারাত্রি নিজের সেই ঘর আর বারান্দার চতুঃসীমানার বাইরে যেতে চাইতেন না, এখন নিয়ম ক'রে সকাল-বিকেল বাগানে পায়চারি করে বেড়ান; জবাই থাকে সঙ্গে। কখন স্নান করবেন, কখন শুতে যাবেন, কখন কি করবেন সব একেবারে নিয়মে বেঁধে দিয়েছে জবা আর সেইগুলোই তিনি—একটু বিরক্তভাবে হলেও, নিঃশব্দেই পালন করে যাচ্ছেন বলা যায়।

বাড়িশুদ্ধ সবাই বড়বাবুর রকম সকম দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। ঘরে বাইরে আলোচনা স্নুরু হয়েছে।

মহেন্দ্রপ্রতাপের দুই মেয়ে, এক ছেলে। ছেলে তো অনেক আগেই বাড়ির সম্পর্ক ছেড়েছে, মেয়ে দুটির বিবাহ হবার পর তাদের আসা-যাওয়াটাও ধীরে ধীরে কমে এসেছে। এখন একরকম বন্ধ বললেই হয়। মহেন্দ্রপ্রতাপ খোঁজও করেন না তাদের। বড় মেয়ে বিমলা এবং ছোট কুন্তলা, দু'জনেরই ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে, এই কলকাতায়। ব্যস্, মেয়েদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন মহেন্দ্র।

কিন্তু মেয়েরা যে ঠিক নিশ্চিন্ত হয়ে আছে সে কথা বলবার উপায় নেই। বাপের বাড়ি আসা বন্ধ হলেও, বাপের বাড়ির খবর রাখা বন্ধ নেই। সব খবরই রাখে তারা এবং নিয়ম করেই রাখে। মহেন্দ্র যতই বদমেজাজ,

অসামাজিক হোন, সরোজিনীকে কুটুম-কুটুম্বিতা সবই দাদার হ'য়ে বজায় রাখতে হয়। মেয়ে দুটোর খোঁজ-খবর নিতে বিধুকে পাঠান মাঝে মাঝে, ঠাকুর নিধিও যায় তত্ত্ব-তাবাস সঙ্গে নিয়ে। বিমলা আর কুন্তলা বাপের বাড়ির হালচালের খবর তাদের মারফতেই পায়। জবা দিদিমণি হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে কেমন করে বড়বাবুকে একেবারে জুড়ে বসেছে, এ খবরটাও কি আর তারা বাড়ির মেয়ে দু'টিকে না বলে পারে? দাদাবাবুতো কবেই বাড়ি ছাড়া হয়েছেন, এখন দিদিমণিদের আসনও বুঝি এই মেয়েটার জন্যেই চিরকালের মতন—

টনক নড়ে বিমলা আর কুন্তলার। শত্রুতে শত্রুতে দেখা হয়, কিন্তু বিয়ের পর বোনে বোনে দেখা হওয়া দুর্ঘট। কিন্তু এত বড় একটা খবর কানে যাবার পর যে যার বাড়িতে চুপ করে বসে থাকেই বা কি করে? বাপই না হয় অবুঝ মানুষ, কিন্তু তাদের তো রক্তমাংসের শরীর।

কুন্তলা খবর পাঠায় বিমলাকে। খামখেয়ালী বুড়ো বাপ, শেষে কি করতে কি করে বসেন কে জানে! এখন থেকে সাবধান হওয়া চাই—

বিমলা যেন অপেক্ষায় ছিল। চিঠি পেয়েই চলে এল ছোট বোনের বাড়ি। বিপদের সময় সামাজিক আদব-কায়দা বজায় রাখতে গেলে চলে না।

দুপুরে কুন্তলার ঘরেই জরুরী সভা বসলো। কুন্তলার স্বামী মন্মথকেও কাজকর্ম ফেলে বৈঠকে যোগ দিতে হ'ল। শ্বশুরমশাই একসঙ্গে নিজের আর তাদের সর্বনাশ করতে বসেছেন, এসময়—

কুন্তলাদের রূপোর প্রকাণ্ড ডিবেটা থেকে গোটা চারেক পান আর আধভরিটাক রূপোলী জর্দা মুখের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিমলা বললো: এখানে বসে কিছুই হবে না কুন্তলা, আমাদের সকলের সেখানে এখুনি যাওয়া দরকার।

কুন্তলা কিন্তু একেবারে মহেন্দ্রপ্রতাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পায় না।

—বাবার মেজাজ তো জান, একেবারে মারমূর্তি হয়ে ওঠেন যদি।

—সে ভয় করলে তো চলবে না এখন। কুন্তলা অভয় দেয় : যে ডাইনি সেখানে এসে জুড়ে বসেছে সেতো সব লুটেপুটে নিলো বলে। বাবা তার কথায় একেবারে ওঠেন-বসেন। নিধু আমায় নিজের মুখে ব'লে গেছে।

—না, না, এর একটা বিহিত দরকার। মন্মথ এখুনি একটা মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—বলতো মন্মথ! এ সব ব্যাপারে দেরী করা কি ভাল? বিমলা আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে : তুই অজয়কে একটা চিঠি লিখে দে—

অজয় কুন্তলার বড়, বিমলার ছোট। অনেকদিন বাড়ি ছাড়া।

কুন্তলা বলে : দাদা কি আসবে! তারও যে বাবার মতোই গোঁ!

সত্যি কথা। বিমলার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। কি করা উচিত ভেবে পায় না। বুদ্ধি যোগায় মন্মথ।

—লিখে দাও না যে বাবার খুব অসুখ, অবস্থা খারাপ। তা হ'লেই ঠিক আসবে।

যুক্তিটা ভালোই লাগে সকলের। সেই মর্মেই চিঠি লেখে কুন্তলা। বাপের ওপর রাগ অভিমান যতই হোক, চিঠি পেয়ে চুপ করে থাকতে পারে না অজয়। কুন্তলার ওখানে এসে হাজির হয়। বিমলাও খবর পেয়ে ট্যাক্সি করে ছুটে আসে। মন্মথই খবর দেয়।

কিন্তু আসল কথাটা শুনে অজয় একেবারে বেঁকে দাঁড়ায়। বাবা যার হুকুম মতো চলুন, যাকে যেমন খুশি সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে যান, এ সব ব্যাপার নিয়ে সে হৈ চৈ করতে নারাজ। কুন্তলা কিংবা বিমলার কিছু বলবার থাকে তারা নিজে গিয়ে বলুক।

—তা হ'লে তুমি নিজে কিছু বলবে না দাদা? কুন্তলা নালিশের সঙ্গে অভিমানের সুর মেশায়।

—না, আমি তোমাদের এসব ব্যাপারে নেই। বাবার অবস্থা খারাপ ব'লে ডেকেছিলে তাই এসেছি, নইলে আমি আসতামও না।

—ও! আসতে না! তা অবস্থা খারাপটা নয় কিসে? বিমলা বলে।

—খারাপ কেন, বলুন সাংঘাতিক। মন্মথ উস্‌কানি দেয়ঃ বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়ে উনি যে সব ভাসিয়ে দিতে বসেছেন।

—আর এতে যে তোরই সর্বনাশ সবচেয়ে বেশী অজয়। বিমলা কনিষ্ঠের মঙ্গলচিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

—তা হোক। আমি বাবার সম্পত্তির লোভ ক'রে ব'সে নেই। আমি এখনও ব'লে যাচ্ছি দিদি, এই নিয়ে আর কেলেঙ্কারি করবার চেষ্টা কোরো না। ভালো হবে না তাতে।

সমস্ত আলোচনার ওপর ছেদ টেনে দিয়ে অজয় চলে যায়।

অজয় যেতে পারে—সে চিরকালই এমনি সৃষ্টিছাড়া, গোঁয়ার-গোবিন্দ, কিন্তু তাই ব'লে এরা তিনজন তো আর চুপ করে থাকতে পারে না। বিহিত একটা না হওয়া পর্যন্ত তাদের স্বস্তি কই?

—শুনলে কথা! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর! বিমলা গলার স্বরটা জোরালো করে তোলেঃ আমি কিন্তু এত সহজে ছাড়বার লোক নই। ওই মায়াবিনী ডাকিনী যে বাবাকে বশ করে সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নেবে সে আমি হ'তে দেবো না। তোমরা কেউ না পারো আমি একলাই যাবো।

—না, না, যাবোনা কেন, নিশ্চয় যাবো। মন্মথ বলেঃ কিন্তু আমি বলছিলাম কি, হাজার হোক আমি জামাই মানুষ, আমার এসব কথা বলা কি সাজে—

—খুব সাজে, বাবা যদি নিজের ঘরে আগুন দিতে চান তুমি জামাই ব'লে তাকে আটকাবে না। কুন্তলা এবার সব সঙ্কোচ কাটিয়ে জোরের সঙ্গেই বলেঃ চলো, আমরা সবাই যাবো।

মন্মথও আর না বলতে পারে না। কুন্তলার ভাগে মহেন্দ্রপ্রতাপের সম্পত্তির ছিটেফোঁটা যদি পড়ে, শেষপর্যন্ত সেটা তো তারই।

কুন্তলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভাবতে লাগলো অজয়। বাড়ির সঙ্গে কিছুকাল তার কোনো সম্পর্কই নেই, ওখানকার ঘটনা সম্বন্ধে কোনো

ঔৎসুক্যও সে বোধ করে না। কিন্তু হঠাৎ কে কোথা থেকে এলো আর দেখতে দেখতে মহেন্দ্রপ্রতাপের মতো কড়া মেজাজের মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেললো? এই মেয়েটিকে দেখবার জন্যে কেমন একটা ঔৎসুক্য বোধ করতে লাগলো অজয়। সহজ মেয়ে নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু বয়েস যেরকম শোনা গেল তাতে এতোখানি সাহস আর বুদ্ধি······

অজয় ডাক্তারের মনে হঠাৎ একটা দোলা লাগলো।

দেখেই আসা যাক বাড়ির কাণ্ডকারখানাটা নিজের চোখে।

অজয় হঠাৎ বাড়ি ফেরায় সবাই আশ্চর্য। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হোলো অজয় নিজে। সিঁড়ির কাছে যখন মুখোমুখি জবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

—একি আপনি!

—হ্যাঁ, আমি আপনাদের সেই মায়াবিনী। কুন্তলার বাড়িতে দুই বোনের বৈঠক এবং সে বৈঠকে অজয়ের উপস্থিতি······এ সব খবর পিসিমার মারফতে আগেই জবার কানে পৌছেছিল, বৈঠকে ওর সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোও বাদ যায়নি। তারই প্রতিক্রিয়া ঘটলো এতক্ষণে···জবা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেঃ আপনার বাবাকে বশ করে সমস্ত সম্পত্তি যে নিজের নামে লিখিয়ে নিচ্ছে; সে আমিই—শুনেছেন নিশ্চয়ই?

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে জবা সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

—শুনুন, আমি কিন্তু কিছুই জানতাম না, আমি—

—কিছু না জেনেই আপনার বাবা ডাকিনীর হাতে পড়েছেন ব'লে বিশ্বাস করেছেন তো! কোমর বেঁধে বোনেদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে তাড়াতেও এসেছেন। দেখুন তাড়াতে পারেন কি না।

জবার ভুল ভাঙাবার শেষ চেষ্টা করলো অজয়ঃ শুনুন, একটা কথা শুনে যান—

—না, আমার আর কিছুই শুনতে বাকি নেই।

বলতে বলতে জবা উপরের ঘরে ঢুকে গেলো।

মনটা মুষড়ে পড়লো অজয়ের। হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় সে বাড়িতে ফিরে এসেছিলো। কিন্তু কুন্তলা, মন্মথ আর বিমলা যে তার আগেই এখানে পৌঁছতে পারে এ কথাটা সে ভাবতে পারে নি। এসে দেখলো যাকে কেন্দ্র ক'রে এই ঝড়, তুফান, সে আর কেউ নয়, জবা; আর বিমলা-কুন্তলার দল এ বাড়িতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে ব'সে আছে।

কি করবে এখন? আশ্রমের ডিস্‌পেন্সারীতে ফিরে যাবে? কিন্তু তা হ'লে জবা কি আর এ বাড়িতে টিকতে পারবে বেশীদিন? তা ছাড়া, তার সম্বন্ধে জবার এই বিশ্রী ধারণা......এটাও তো ভাঙা দরকার।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবলো অজয়। তারপর ফিরে এলো নিজের ঘরে। অনেকদিন পর।

মেয়েটির গুণপনার কথাই শোনা ছিল এত দিন, এখন সামনা-সামনি দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেলো মন্মথ। এত রূপ!

মন্মথ সিঁড়ি দিয়ে নামছিলো। জবা মহেন্দ্রর জন্য হরলিক্স নিয়ে উপরে উঠছে। ঠিক সেই সময় মুখোমুখি! মন্মথ অকারণ হাসলো, যদি চোখ পড়ে জবার। কিন্তু...না, জবা ওর দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না।

পৌরুষে ঘা লাগলো! মন্মথ ডাকলোঃ শুনুন—

জবাকে থামতেই হোলো।

মন্মথ একটা ঢোক গিললেঃ কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমার গোটাকতক কথা বলবার ছিল—

—বলুন।

—এ বাড়ির সবাই আপনার শত্রু তা জানেন তো?

মন্মথর গলায় একেবারে আত্মীয়তার সুর। অবশ্য এদিক ওদিক চেয়ে দেখে নিলো, কাছাকাছি আর কেউ আছে কি না। সাবধানের মার নেই।

জবা কিন্তু চুপ।

মন্মথ হাল ছাড়লে না, গলার স্বর এবার আবেগে ভিজিয়ে নিয়ে বলতে লাগলো : কিন্তু এরি ভেতর একজন আপনার কতো বড়ো সত্যিকার বন্ধু আছে তা বোধহয় জানেন না।

—জানতাম না এতো দিন।...কিন্তু এই কথাই কি বলবার ছিল আপনার ?

—না, না, এ আর এমন কি কথা। তবে আসল কথাগুলো একটু গোপন কি না, তাই একটু নিরিবিলিতে যদি—

মন্মথর অদৃষ্ট খারাপ, ঠিক সেই সময় কুন্তলাকেই এদিকে আসতে দেখা গেল। জবাই দেখলো প্রথম, তারপর বললে : বেশ, নিরিবিলিতেই শুনবো। কিন্তু এখন তো আর হবে না।

—না, না, হবে না কেন, আসুন না এদিকে—কুন্তলাকে না দেখেই আরম্ভ করেছিল মন্মথ, কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্বর পাল্টাতে দেরি হোলো না; আপনাকে ভালো কথায় বলছি, যা ভাবছেন এদিকে তার সুবিধে হবে না। মানে মানে এই বেলা সরে পড়ুন।

উত্তর না দিয়ে জবা উপরে উঠে গেল। মুখে ব্যঙ্গের হাসি।

—বলি হচ্ছিল কি ? কি বলছিলে ওই ডাইনীকে ?

কুন্তলা কাছে এসে জেরা সুরু করলো।

—কি আবার ! যা বলবার সবই বলে দিলাম—মানে, বেশ কড়া করে শুনিয়ে দিলাম।

—থাক, আর সাধু সাজতে হবে না। আমি নিজের কানে সব শুনেছি। সাত বছর ঘর ক'রে তোমায় চিনতে আর বাকি নেই। সুন্দরী মেয়ে কোথাও দেখেছো কি তোমার আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না।

খুব বিপদে পড়লো মন্মথ। আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলবার উপায় পর্যন্ত নেই।

কুন্তলা আবার ধমকে উঠলো : ফের যদি ওই ডাইনীর পিছনে ছুটতে দেখি তো কুরুক্ষেত্র করবো বলে রাখছি।

—এই ছাখো— ! কি বললাম, আর কি হোলো ! আমার কপালে সবই উল্টো বুঝলি রাম !

মন্মথর গলার আওয়াজটা এখন প্রায় কান্নার মতো।

এ সব কাজে দেরি মানে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা। কিন্তু বদমেজাজী লোক মহেন্দ্রপ্রতাপ—সব রকম খবর না নিয়ে, আটঘাট না বেঁধে, তাঁর সামনে যাওয়া যায় না। মন্মথকে নিয়ে দুই বোনে গিয়ে পিসিমাকে ধরলো।

সরোজিনী নিচে নামছিলেন।

কুন্তলা জিজ্ঞাসা করলো: বাবা কি একলা আছেন পিসিমা, না সেই ডাইনীটাও আছে?

—ডাইনী টাইনী জানি না মা, ডাক্তারবাবু আছেন। পিসিমা জবাব দিলেন।

বিমলা বললে: এই ডাক্তারবাবুটিও কম যান না। ওই ডাইনীর সঙ্গে ঠিক ওঁর একটা ষড় আছে।

সরোজিনী রেগে গেলেন, বললেন: ছিঃ বিমলা। মানুষকে অতো ছোট করে দেখিস না। ডাক্তারবাবুর মতো লোক, জবার মতো মেয়ে সংসারে কটা দেখেচিস?

বিমলা চুপ করবার মেয়ে নয়, মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো: জানি গো জানি; ও মায়াবিনী যে তোমাকেও বশ করেছে তা জানি। কিন্তু আমরা অত সহজে ছাড়চি না। এসো মন্মথ—

সরোজিনী মুখ ভারী করে নেমে গেলেন। তারা তিনজনে উপরে উঠলো। উঠলো বটে, কিন্তু মহেন্দ্রর ঘরের কাছ বরাবর এসে পা যেন আর চলতে চায় না। কুন্তলা তো একেবারে ফিরে যাবার উপক্রম।

বিমলা বললে: আয় না, ভয় কি!

সত্যি, এতটা এগিয়ে এখন কি আর—

কুন্তলাও ঢোক গিলে বললে: না, না, ভয় কিসের!

—না, না, ভয় কিসের—চলো না। মন্মথও সায় দিলে।

শেষ পর্যন্ত বিমলা এক রকম কুন্তলাকে জোর করেই টেনে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে।

মহেন্দ্র একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে পরিষ্কার করছিলেন। মেয়ে দু'টি এবং জামাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, দেখছিস কি? মনে আছে এ বন্দুকের কথা। একটু বুড়ো সেকেলে হ'লে কি হবে, এখনও ডাকলে সাড়া দেয়। অন্তত গোটা দশেক জোরদার কেঁদো আর ডজনখানেক বুনো মোষের খবর নিয়েছে। বন্দুকটা কোলের উপর নিয়ে সস্নেহে হাত বুলোতে লাগলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ।

বিমলাই সাহস করলে শেষ পর্যন্ত।

—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল বাবা।

কথাটা যে কি তা আর বুঝিয়ে বলতে হোলো না। মহেন্দ্র যেন তিন-জনকে একসঙ্গে দেখেই অনুমান করে নিলেন।

—হুঃ! সব জোট বেঁধে আসা হয়েছে দেখছি। তা সে ব্যাটা কোথায়—সেই দিগ্‌গজ ডাক্তার অজয়বাবু?

—দাদাও এসেছে—নিচে আছে। চোখকান বুঁজে বললে কুন্তলা।

—হুঃ, সে ব্যাটার তবু একটু জ্ঞান-গম্যি আছে, একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় নি। কিন্তু ব্যাপার কি বলতো? হঠাৎ সবাই জোট পাকিয়ে এ বাড়িতে—?

বিমলা বললে: অনেকদিন আসিনি তাই। এই তোমাকে একটু দেখতে এলাম।

—দেখতে এলে। দেখবার জন্যে প্রাণ ছটফট করছিলো বোধ হয়? কিন্তু আমি তো তোমাদের দেখতে ডাকিনি। মহেন্দ্র অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

—আপনি তো কোনো কালেই ডাকেন না, কিন্তু আমাদের তো ইচ্ছে করে দেখতে। মন্মথ এবার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলো।

ফল হোলো বিপরীত। মহেন্দ্র বললেন: দেখতে ইচ্ছে করে তো

একটা ফটো রেখে দিলেই পারো। ছ'বেলা দেখতে পাবে। এখানে আসবার দরকার কি?

—কি যে বলো বাবা! নিজের ছেলেমেয়ে জামাই তোমার কাছে আসবে না? কুন্তলা অনুযোগ করলে।

আরও স্পষ্ট করে বললো বিমলা: কোথাকার কে এসে তোমার এখানে লুটে পুটে খাচ্ছে, আর আমরা এলেই দোষ!

যেটুকু অনুমানের বাইরে ছিল সেটুকুও একেবারে পরিষ্কার বোঝা গেল। মহেন্দ্র বললেন: বটে! এই জন্যেই সবাই ঘোঁট পাকিয়ে এসেছো! আমি তাই ভাবছি, হঠাৎ এত পিতৃভক্তি উথলে উঠলো কেন!

—দেখুন, আপনি বিদ্রূপ করতে পারেন, কিন্তু আপনার প্রতি আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে! আপনার যাতে অনিষ্ট হয়—

মন্মথ সামলাবার চেষ্টা করছিলো ব্যাপারটা, কিন্তু তার আগেই শ্বশুর-মশাই সিংহ-বিক্রমে চিৎকার করে উঠলেন: গেট আউট! বেরিয়ে যাও—এখুনি বেরিয়ে যাও বলছি—

কুলমর্যাদা আর আত্মসম্মানে ঘা লাগলো মন্মথর।

—বেরিয়ে যাবো! আমায় বেরিয়ে যেতে বলছেন? মনে রাখবেন আমি আপনার জামাই!

তাতেও কাজ হোলো না।

—নিকুচি করেছে জামাইএর! মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন: তোমার মতন জামাই আমি থোড়াই কেয়ার করি।

এমন রুক্ষ দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন মন্মথর দিকে যে মনে হোলো বন্দুকটা দিয়ে গুলীই করে বসেন বুঝি!

মেয়ে ছ'টি বা জামাই কেউ আর সেখানে দাঁড়ানো যুক্তিযুক্ত মনে করলো না।

বিমলা-কুন্তলার নালিশে কোনো ফল হয়নি, এ খবর অজয়ের কানেও পৌছলো। নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো অজয়। যাক্, আপাতত

তা হ'লে জবার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাববার কিছু নেই। সুতরাং ডিস্‌পেন্সারীতে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। তবে যাবার আগে বাবার সঙ্গে দেখাটাও করে যাবে, এইটেই ঠিক করলো। এবার এসে পর্যন্ত তাঁকে এড়িয়ে চলেছে—কিন্তু, না, কোন ভুল ধারণাই সে পেছনে ফেলে যাবে না।

মহেন্দ্র আলমারি থেকে একরাশ মোটা মোটা পুরনো বই বার করে খাটের উপর রাখছিলেন, ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, এই যে ডাক্তারবাবু, কি মনে করে?

—আমি আজ চলে যাচ্ছি বাবা।

—হুঁ, চলে যাচ্ছো! আমার হুকুম নিয়ে কি এসেছিলে যে যাবার সময় হুকুম নিতে এসেছো?

—হুকুম নিতে আসিনি। তোমায় জানাতে এলাম। তোমার শরীর খারাপ শুনে এসেছিলাম। এখন তো দেখছি ভালোই আছো।

—হ্যাঁ ভালোই আছি, খুব ভালো আছি। তেজ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে তুমিও তো খুব ভালো আছো!

—তা একরকম আছি। কিন্তু তেজ করে তো বাড়ি ছেড়ে যাইনি বাবা। এখানে থাকলে কিছুতেই তোমার সঙ্গে বনে না, শুধু শুধু তোমার মেজাজ খারাপ হয়, তাই একটু দূরে গিয়ে আছি। তা ছাড়া আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানো তো দরকার!

—ও, সে গোঁটুকু আছে তা হ'লে! তা কতোখানি দাঁড়িয়েছো শুনি? কতোগুলো রুগী এ পর্যন্ত মারলে?

বাবার কথার ধরণ-ধারণগুলো জানা, তাই রাগ না করে হাসতে হাসতেই বলে অজয়: খুব বেশী মারতে পারিনি। ওষুধ দিলেও কি করে যেন সেরে ওঠে।

মনে হোলো, মহেন্দ্রর চোখে-মুখেও হঠাৎ যেন প্রসন্নতার আমেজ লেগেছে—কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন: হুঁঃ, সেরে ওঠে তোমাদের ওই ডাক্তারী ওষুধে! আমি বিশ্বাস করি না।

—কি করে করবে! তুমি তো আর আমার চিকিৎসা নিলে না।

—তোমার চিকিৎসা নেবো ! আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপাতত মেজাজ একটু ভালো আছে—এখনি হয় তো বিগড়ে বিকল হয়ে বসবে। অজয় পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে মহেন্দ্রর সেই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ফুলো পায়েই হাত দিয়ে বসলো।

—আরে ব্যথা, ব্যথা ! মহেন্দ্র আর্তনাদ করে উঠলেন : এ পায়ে ব্যথা—আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। দূর হও এখান থেকে।

আর্তনাদ নিতান্তই পায়ের ব্যথার জন্য কি না সেটা ভালো বোঝা গেল না। অজয় হাসতে হাসতেই বিদায় নিলো।

ওদিকের দরজা দিয়ে জবা ঘরে ঢুকতেই মহেন্দ্র বলে উঠলেন : দেখলে আমার ছেলেটাকে ? একেবারে কাঠ-গোঁয়ার।

—আপনারি তো ছেলে !

কথাটার মধ্যে একটু খোঁচা ছিল। মহেন্দ্র কিন্তু রাগ করলেন না। বেশ সহজভাবেই বললেন : হুঁ:, তা বলতে পারো। দিয়েছি তাই দূর করে তাড়িয়ে।

শেষ কথাটা বললেন বেশ খুশীর সঙ্গে।

—সেটা কি ভালো করেছেন ? জবা জানতে চাইলো।

—ভালো করি নি ! তুমি জানো না মা, খুব ভালো করেছি—ওতে ভালো হয়। ও ব্যাটার ঠাকুরদাদা—আমার বাবাও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। ওতে ছেলেরা মানুষ হয়, বুঝেছো, মানুষ হয় !

যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে সেই ধরে। বাবার কাছে একবার ধমক খেয়েই হার স্বীকার করতে রাজী নয় বিমলা। কুন্তলাকে ডেকে বললে : চ', বাবার কাছে যেতে হবে।

কুন্তলা রাজী নয়। বললে : লাথি-ঝাঁটা খাবার জন্যে আমি আর যেতে রাজী নই। আমরা আজই চলে যাবো ঠিক করেছি !

—ওই ডাইনীর কাছে হার মেনে চলে যাবি ?

—তা ছাড়া আর কি করতে পারি বল্ ?

—দেখি না কি পারি। সেবা করবার ভাণ করেই তো রাক্ষুসী বাবাকে ভুলিয়েছে। এখন থেকে ওকে আর বাবার কাজে হাতই দিতে দিচ্ছি না।

ওষুধের শিশি আর গ্লাসটা নিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বিমলা বললো : আয়, বাবার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। আজ থেকে এ ভার আমিই নিলাম।

মহেন্দ্র একমনে প্রকাণ্ড একটা খাতায় কি লিখছিলেন। দুই বোন সন্তর্পণে তাঁর পিছনে দাঁড়ালো।

বিমলা বললে : তোমার ওষুধটা এখন দেবো বাবা ?

—না, না, তোমাদের দিতে হবে না। যাও, যাও—লিখতে লিখতেই বললেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। মুখও তুললেন না।

—ওষুধ খাবার সময় হয়েছে যে ! কুন্তলা বললো।

—সময় হয়েছে তো তোমাদের কি ! সে জবা জানে।

—সে তো নেই।

—আচ্ছা, সে ঠিক সময় আসবে 'খন। তোমরা যাও, বিরক্ত কোরো না।

—আমরা তোমার কাছে এলেই তো তুমি বিরক্ত হও। আমরা যেন তোমার সেবা কখনও করিনি। করতে জানি না—

অভিমান আর অনুযোগে কুন্তলার স্বরটা আনুনাসিক হয়ে উঠলো।

মহেন্দ্র বললেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের সেবা আমার হাড়ে হাড়ে জানা আছে—এখন যাও।

—তোমার নিজের মেয়েদেরই তুমি দু'চক্ষে দেখতে পারো না। বিমলা বললো। তাতেও ফল হোলো না। মহেন্দ্র বললেন : পারি না-ই তো ! নিজের মেয়ে বলেই তো তোমাদের চিনতে আমার আর বাকি নেই। কিন্তু যে মতলবে এসেছো তা হবে না—

শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা যায় না। এবার খোলাখুলি বলা দরকার। বিমলা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলো : আমরা বুঝি শুধু মতলব নিয়েই

তোমার কাছে আসি? মতলব নিয়ে সত্যি যে এসেছে তাকেই চিনতে পারো না!

কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র যে ফিরে এসে তাদেরই বক্ষঃস্থল ভেদ করবে তা কে ভেবেছিলো। মহেন্দ্র খাতা-কলম ফেলে টেবলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

—কি! কি বললি?

—বললে তুমি ক্ষেপে যাবে জানি, কিন্তু না বলেও পারছিনে। বিমলা বেশ জোর গলাতেই বলে চললো: ও ডাকিনী মেয়ে তোমায় নির্ঘাৎ গুণ করেছে। নইলে শুধু ওই ঢলঢলে মুখখানি দেখে ভুলে যাও। ও তোমার কাছে অমনি ভিজে বেড়ালটি সেজে থাকে, আর ওদিকে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় যার তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবার জন্যে। ও যে কি সর্বনেশে মেয়ে মন্মথকেই জিজ্ঞাসা কোরো। মন্মথর চোখকে তো আর ফাঁকি দেবার জো নেই। সে. সাহানসা ছেলে। অমন অনেক মেয়ে চরিয়েছে। ওর সঙ্গে ঢলাঢলি করবার কম চেষ্টা ও করেছে।

জবার চরিত্রের ওপর এতবড় কলঙ্কও কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপকে টলাতে পারলো না। টেবলে সশব্দে একটা ঘুঁষি মেরে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: পাজী, নচ্ছার, বদমাইস মন্মথই এই সব বলেছে বুঝি! তাই দু'দিন ধরে মেয়েটার মুখখানা এমন শুকনো। মুখে একটা কথা নেই বেচারার!

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বন্দুক রাখবার স্ট্যাণ্ডের কাছে এগিয়ে গেলেন, উপরের বন্দুকটা তুলে নিয়ে গর্জন করে উঠলেন: সে হতভাগাকে আমি গুলী করে মারবো, এখুনি গুলী করে মারবো।

কুন্তলা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। বিমলা ছুটে গিয়ে তাঁর হাত-চেপে ধরলো: বাবা, বাবা···কি করছো বাবা! তোমার জামাই হয় বাবা—

—হোক জামাই, অমন নচ্ছার জামাই না থাকাই ভালো।

বিমলাকে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলেন। কুন্তলা ডুকরে কেঁদে উঠলো। গোলমাল শুনে সরোজিনী এসে হাজির।

—কি করছো দাদা? কোথায় যাচ্ছো?

—খুন করতে যাচ্ছি সেই হতভাগা হারামজাদাকে !

সরোজিনীকেও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন মহেন্দ্র। ওদিকে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো জবা।

বন্দুক হাতে মহেন্দ্রর চোখ দু'টো রক্তাভ—রগের শিরাগুলি ফুলে উঠছে, দুর্বিসহ ক্রোধ আর উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছে থর থর করে।

—কি কেলেঙ্কারী হচ্ছে ! বন্দুকটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললো জবা : পাগলামীরও একটা সীমা আছে। আর সত্যি তো আপনি উন্মাদ ন'ন।

—উন্মাদ আমি হয়েছি। সে হতভাগা নচ্ছার কি বলেছে জানো ? আমি তাকে খুন করবো।

সামনের সোফায় বসে হাঁফাতে লাগলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ।

জবা বন্দুকটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে স্ট্যাণ্ডে রাখলো। তারপর মহেন্দ্রর কাছে এসে তাঁর গলার বোতামটা খুলে দিয়ে, বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বললো :

—মুখ চোখের অবস্থা দেখেছেন আপনার ? নিজেই যে এখুনি খুন হ'য়ে যাবেন।

হাত দিয়ে মহেন্দ্রর নাড়ির স্পন্দনটা অনুভব করলো, তারপর সোফার উপরেই তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বললো : এখন আর একটিও কথা নয়। চুপ করে শুয়ে থাকুন।

শিশি থেকে একটা 'সিডেটিভ' নিয়ে গ্লাসে ঢালতে লাগলো জবা।

সরোজিনী বিমলা আর কুন্তলাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওষুধের ক্রিয়ায় উত্তেজনা ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসে, মহেন্দ্র চোখ বুঁজে পড়ে থাকেন। সেইখানে—মহেন্দ্রর শিয়রে দাঁড়িয়েই জবা মনস্থির কোরে ফেলে। এবাড়িতে আর নয়। বহুকাল পরে এখানে সে নিশ্চিন্ত একটু আশ্রয় পেয়েছিল, এই খামখেয়ালী মানুষটিকে নিয়েই নিরুপদ্রবেই কাটিয়ে দিতে পারতো তার দিনগুলো—কিন্তু আর না। আত্মসম্মানের প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠছে আবার। এই সম্মান বোধটুকুর জন্যেই মামীমার আশ্রয় ছেড়েছিলো

সেই ছোট বেলায়; সেটুকু বিসর্জন দিয়ে এখানকার স্বাচ্ছন্দ্য সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। কুন্তলা-বিমলার জিভের বিষ আজ তার মনটাকে পর্যন্ত বিষিয়ে তুলেছে। এখানে থাকতে গেলে এখন থেকে তাদের সন্দিগ্ধ, কুটিল দৃষ্টির সামনেই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবে। তা সে পারবে না, কিছুতেই না।

মহেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়তে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এলো জবা। ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলো বিছানার ওপর।

দিন দুই পরে সাধন এল দেখা করতে।

জবা যেন তারই অপেক্ষায় ছিল।

—আমার একটা কাজ করে দেবে সাধনদা?

—কি কাজ দিদিমণি?

—আমায় কোথাও একটা থাকবার জায়গা খুঁজে দেবে?

—থাকবার জায়গা! কেন বলোতো?

—দোহাই তোমার সাধনদা, এখন কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না। কিন্তু আজই—এক্ষুনি আমার সঙ্গে তোমায় বেরোতে হবে।

—কি বলছো দিদিমণি, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! এমন কাজ, এমন জায়গা ছেড়ে তুমি কি চলে যেতে চাও?

—হ্যাঁ সাধনদা, আমার না গেলেই নয়—আর এক্ষুনি।

—কিন্তু এখুনি তোমার মতো জায়গা কোথায় পাবো দিদিমণি?

—কোথাও না পাও, তোমার নিজের একটা আস্তানা তো আছে?

—সে কি দিদিমণি! তুমি কি সেখানে থাকতে পারবে?

উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় সাধনের চোখ ফেটে জল আসবার উপক্রম! কিন্তু না বলতে পারে না জোর করে। নিশ্চয় একটা কারণ আছে, নইলে জবা দিদিমণি এমন ক'রে এখান থেকে যেতে চাইবে কেন।

জবা হাসতে-হাসতে বললো: পারি কি না পারি দেখা যাবে। তুমি বসো সাধনদা, আমি এখুনি তৈরী হয়ে আসছি।

মহেন্দ্রপ্রতাপের অট্টালিকা ছেড়ে জবা সেই দিনই এসে উঠলো সাধনদের বস্তিতে।

মাঝখানে একটা ইট বারকরা উঠোন, আর চারদিকে খুপরি খুপরি ঘর—শহরের একেবারে বাইরের দিকে বললেই হয়। নড়বড়ে একটা ভাঙা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে উপরেও ঘর আছে খানকয়েক। এগুলোতে তবু একটু আলোবাতাস আসে। সাধনের ঘরখানা উপরে এই যা রক্ষে।

জবাকে নিয়ে সেই দিকেই যাচ্ছিল সাধন। সিঁড়ির কাছে পৌছবার আগেই দেখা হয়ে গেল বাড়িওলার ছেলে নগেনের সঙ্গে।

—ওহে সাধন, চোখে যে আর দেখতেই পাও না? একটু শুনে যাও।

—একটু দাঁড়ান। এখুনি আসছি। যেতে যেতেই বললে সাধন। জবাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

—আমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে থাকে যেন।

বেশ কিছুটা ঔৎসুক্য নিয়ে নগেন জবার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। খাশা মেয়ে। এ বুড়োটা একে জোটালে কোথা থেকে?

উঠোনের মাঝখানেই এজমালি কল—মেয়ে-পুরুষের ভিড়। কেউ গেঞ্জি কাচছে, কেউ রান্নার জল তুলছে। ঔৎসুক্যটা তাদের মধ্যেও বড় কম জাগলো না। কেউ কেউ কাচাকুচি ফেলে উঠে এসে দাঁড়ালো সেই সিঁড়ির কাছেই।

নগেন বললে: এটি আবার কে হে? কোথা থেকে আমদানি হোলো?

—আজ্ঞে আমরা তো চিনি না। ভদ্দর লোকের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। বললো একজন।

—হুঁঃ, ভদ্দর লোকের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এই বস্তিতে আসবে! নগেনের প্রলুব্ধ দৃষ্টি তখন সিঁড়ির উপর দিকে পৌছেচে।

মুখফোঁড় বলাই ছিল দলের মধ্যে, সে বললো: তা তো বটেই। ভদ্দর লোকেরা বড় জোর ভাড়া আদায় করতে এসব নোংরা জায়গায় আসতে

পারে, কি বলেন নগেনবাবু? বস্তিটা নোংরা হোক, ভাড়ার টাকাটা তো নোংরা নয়।

সঙ্গে সঙ্গে হিহি হাসি। চটে উঠলো নগেন।

—নোংরা হবে কেন! চুরির টাকা তো নয়। যতো সব—

গরগর করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো নগেন। সাধনের কুঠরিঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। সাধন ইতিমধ্যে ঘরের দরজা খুলে জবাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেছে।

—কই হে সাধন, আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে আর যে আসবার নাম নেই!

—আজ্ঞে এই যে—

বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সাধন।

—বলি লুকিয়ে লুকিয়ে আর ক'দিন বেড়াবে?

—আজ্ঞে লুকিয়ে বেড়াবো কেন?

—স্পষ্ট লুকিয়ে বেড়াচ্ছ আবার বলছো না! কতোদিন ধ'রে তোমার খোঁজে এসে ফিরে যাচ্ছি জানো?

—আজ্ঞে পেটের ধান্দায় সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই—

—তা রাতটাও রাস্তায় কাটিয়ে দিলেই পারো। ভাড়া না দিয়ে আমার ঘরখানা জুড়ে রাখবার মানে হয় না।

—আজ্ঞে ভাড়া আপনার দুচার দিনের মধ্যেই চুকিয়ে দেবো—

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই জবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

—তোমার ভাড়া কতো বাকি সাধনদা?

—বেশী না দিদিমণি, বিব্রত হয়ে উঠলো সাধন: এই দু'মাস একটু সময় খারাপ যাচ্ছে, তাই···কটা টাকা বাকি পড়ে গেছে। দুচার দিনের ভেতর দিয়ে দেবো।

—দু'চার দিন তো আজ দু'মাস ধরে শোনাচ্ছো! নগেন খেঁকিয়ে উঠলো। জবা জিজ্ঞাসা করলে: দুমাসের কতো টাকা ভাড়া আপনার পাওনা?

—কতো আর! পাঁচ দু'গুণে দশ টাকা। কিন্তু আমি তো মাসের পর মাস ভাড়া ফেলে রাখতে পারি না।

—না, ফেলে রাখতে আপনাকে হবে না। এই নিন আপনার দু'মাসের ভাড়া। হাতব্যাগ থেকে দশটাকার একটা নোট বার করে দিলো জবা।

সাধন বললে: ওকি দিদিমণি, তুমি দিচ্ছো কেন?

নগেনও অপ্রস্তুতভাবে বলে উঠ্‌লো: হঁ্যা, আপনি দিচ্ছেন কেন?

—আপনার ভাড়া পেলেই হোলো। কেন দিচ্ছি তা আপনার জানবার দরকার নেই। কথাটা বলেই জবা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ডাক্‌লো: এসো, সাধনদা।

নগেন হতভম্বের মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। নিচে থেকে বলাই সবই দেখছিলো। গলা বেশ চড়িয়ে সে বলে উঠলো: কি নগেনবাবু, ভাড়া তো পেয়েছেন, আর দাঁড়িয়ে কেন?

নগেন তার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ঘরে ঢুকে সাধন বললে: এখানে কেন তুমি এলে বলোতো দিদিমণি? ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তো আমার জন্যে গুণগার দিতে হলো? এ কি তোমার জায়গা?

—জায়গা আর কোথায় পেলাম সাধনদা? জবা হাসতে হাসতে বললো: তা ছাড়া এখানে খারাপটাই বা কি? তোমরা এতোজন যেখানে থাকতে পারো আমি সেখানে থাকতে পারিনা?

সাধন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো: আমাদের কথা ছেড়ে দাও। আমাদের সংগে তোমার তুলনা?

—ছি, ওকথা বোলোনা সাধনদা। মানুষ সবাই সমান। শুধু অবস্থার ফেরে আলাদা দেখায়। তুমি কিছু ভেবোনা, এখানে আমি বেশ থাকবো।

জানিনা দিদি, তোমার কথা শুনে তোমাকে এখানে এনে ভালো করলাম কি না, আমার অবস্থা তো চোখেই দেখছো। তোমার যা ধূলোগুঁড়ো আছে, তা আমার অভাবের ফোকর দিয়ে দু'দিনেই গলে যাবে। তারপর

চালাবে কি ক'রে? অমন ভালো কাজটাও তো ছেড়ে দিয়ে এলে! ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লো সাধন। জবার কিন্তু দুর্ভাবনার কোন লক্ষণই দেখা গেলোনা। সে উৎফুল্ল মুখে বললো: তুমি দেখোনা, আবার একটা কাজ আমি ঠিক যোগাড় করে নোবো।

সাধন কি যেন একটু ভাবলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো: আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলো তো দিদিমণি, তোমার আপনার জন কি কেউ কোথাও নেই?

মুহূর্তের জন্য যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো জবা। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো: না সাধনদা, তুমি ছাড়া আমার সত্যিকার আপনার জন আর কেউ নেই।

১

বিশ্ববন্ধু ডিটেকটিভ এজেন্সীর কাছ থেকে একটা খবর পেয়ে রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। খবর পাওয়াটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে বর্মায় আর তাঁর ভালো লাগছিল না, দাদার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার খোঁজটা পাবার জন্যে তিনি অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়েছিলেন। ডিটেকটিভ এজেন্সীর চিঠি পেয়ে মনস্থির করতে তার দেরি হোলো না। ওরা নাকি খোঁজ পেয়েছে রত্নেশ্বরের দাদার একটি মেয়ে ছিল। তার খোঁজ পাবার মতো ঠিকানাও বুঝি একটা জোগাড় করেছে।

রত্নেশ্বর কলকাতায় ফিরতেই দুর্গাদাস আর পার্বতী এসে দেখা করলো।

পার্বতী বললো: আজ্ঞে, এ ঠিকানা কি কষ্টে যে জোগাড় করেছি তা আপনাকে আর কি বলবো! আমাদের বিশ্ববন্ধু এজেন্সী ছাড়া আর কারও ক্ষমতা ছিলো না।

রত্নেশ্বর: আপনাদের ক্ষমতার দৌড় খুব ভালো ভাবেই বোঝা গেছে। বারো বছর ধ'রে একটি মেয়ের খোঁজ করে শুধু একটা ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন। তাও সে ঠিকানা সত্যি কি না এখনও জানা নেই।

দুর্গাদাস: আজ্ঞে বলেন কি! ও ঠিকানা সত্যি না হয়ে পারে!

আমরা ভালো করে খোঁজ নিয়েছি। ওই হোলো আপনার ভাইঝির আপন মামার বাড়ি—

পার্বতী : বারো বছর এমন আর কি বেশী!

রত্নেশ্বর : নাঃ, তা আর কি বেশী! বারোর বদলে বাহাত্তর বছর হ'লেই ঠিক হ'ত বোধ হয়!

কাঠখোট্টা, বেরসিক গোছের স্পষ্টভাষী লোক এই রত্নেশ্বর মুখুজ্যে। কাউকে খাতির করে কথা বলেন না। দুর্গাদাস আর পার্বতী দু'জনেই ঘাবড়ে গেল।

তবু দুর্গাদাস সাহস করে বললে : আপনি আমাদের ওপর অবিচার করছেন। কোন একটা খেই নেই, নামটা পর্যন্ত জানা নেই। এতো বড়ো দুনিয়ায় একটা পাঁচ বছরের মেয়ের খোঁজ পাওয়া কি সোজা।

পার্বতী : যেন বালির গাদায় এক দানা নুন খোঁজা!

—খুব কাজ করেছেন! রত্নেশ্বর প্রশংসা করলেন না তামাসা করলেন বোঝা গেল না : আপনাদের ভাবনার কোন কারণ নেই। ঠিকানা যদি ঠিক হয় পুরস্কার পাবেন।

পার্বতী আর দুর্গাদাসের চোখ-মুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রত্নেশ্বর বললেন : তবে এর পর আর আপনাদের দরকার হবে না। আমি এখন এখানে থাকবো বলেই এসেছি। নিজেই খোঁজ করবো। নমস্কার—

ডিটেকটিভ এজেন্সীর দুই কর্মবীরের মুখ-চোখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রত্নেশ্বর চেয়েও দেখলেন না, উপরে উঠে গেলেন।

ঠিকানা মিলিয়ে রত্নেশ্বর যে বাড়িতে হাজির হলেন সেটা আমাদের চেনা। মামীমা পুরবালার আশ্রয়ে জবার ছোট বয়সের অনেকগুলো দুঃসহ দিন আর রাত্রি কেটেছিলো এ বাড়িতে।

আধা মিলিটারী পোশাকে মোটা একটা বর্মা চুরুট ধরিয়ে রত্নেশ্বরকে গাড়ি থেকে নামতে রেখা আর প্রতুলই দেখলো প্রথম। রত্নেশ্বর সোজা

বৈঠকখানাতেই ঢুকেছিলেন। প্রতুল আর রেখা ঘাবড়ে গিয়ে মাকে এনে হাজির করলো।

রত্নেশ্বর মহিলাটিকে হাত তুলে একটা শুকনো নমস্কার করলেন, প্রতুলের মাও ঘাবড়ে গিয়ে নমস্কার করলো।

রত্নেশ্বর হুকুমের ভঙ্গীতে বললেন : বসুন।

তারপর নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

—আমার নাম রত্নেশ্বর মুখার্জি। আমার দাদার নাম নিবারণ মুখার্জি। তিনি মারা গেছেন।

—আমি তো ঠিক—

—বুঝতে পারছেন না? বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনার স্বামীর এক বোন ছিলো, জানেন বোধ হয়। আমার দাদার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো।

—ও! আপনি আমার নন্দাইয়ের ভাই?

—নন্দাই! বিরক্তিসূচক একটা ভঙ্গী করলেন রত্নেশ্বর : নন্দাই টন্দাই আমি বুঝি না। ত্রিশ বছর ইণ্ডিয়ার বাইরে আছি, ওসব বাঙালী রেওয়াজ ভুলে গেছি। বললাম তো, আমার দাদা আপনার স্বামীর বোনকে বিয়ে করেছিলেন।

—হ্যাঁ বুঝেছি। তারপর—?

—তারপর আর কিছু নেই। আমায়, বার্মা···জানেন? না জানবারই কথা। সেখানে আমার ব্যবসা টেবসা আছে। দাদা-বৌদি মারা যাবার পর সেখান থেকেই খোঁজ করছি তাদের কেউ আছে কি না।

—কেন বলুন তো?

—কেন আবার! আমার টাকাকড়ি সম্পত্তি দিয়ে যাবো বলে। বিয়ে থা করিনি, আমার টাকা খাবে কে? অনেক খুঁজে পেতে আপনাদের বাড়ি এলাম। রত্নেশ্বরের শেষ কথা কটার সঙ্গে সঙ্গে ওপক্ষের মুখের চেহারাই যেন বদলে গেল। প্রতুল, প্রতুলের মা, রেখা সবাই এখন সচকিত উত্তেজনায় চঞ্চল। প্রতুলের মার মুখের বিরক্তির ভাবটা এতক্ষণে

শ্রদ্ধায় এবং বিস্ময়ে রূপান্তরিত। বাইরে ব্যবসা করে! অগাধ পয়সার মালিক নিশ্চয়ই! ছেলেপুলে নেই—

—তা বেশ করেছেন, বেশ করেছেন! পুরবালা একেবারে শশব্যস্ত হয়ে পড়েন: এতোদিন পরে দেশে ফিরেছেন, আপনার জনের বাড়ি না এসে যাবেন কোথায়? ওরে প্রতুল প্রণাম কর, রেখা—

রেখা কিংবা প্রতুল কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলো। সহজে ঘাড় হেঁট করা তাদের নিয়ম নয়।

ছেলে-মেয়ের বেয়াড়াপনা মাকেই সামলাবার চেষ্টা করতে হয়।

—এই দু'টি আমার ছেলে-মেয়ে। তিনি চলে যাবার পর এই দু'টির জন্যেই আমায় সংসারে বাঁধা পড়ে থাকতে হয়েছে। ভারি লাজুক দু'জনে—

প্রথমদিকে গলার আওয়াজটা বেশ শোকাবহ করে তুলেছিলেন, পরমুহূর্তেই ছেলে-মেয়ের দিকে চেয়ে প্রায় ধমকে উঠলেন: কই, প্রণাম কর।

—থাক্, থাক্। ও সব শিক্ষা হয়নি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, দাদার কেউ আছে কি না তাতো বললেন না?

এ প্রশ্ন হবেই এবং তার কি জবাব দেওয়া যায় সেইটেই এতোক্ষণ ভাবছিলেন পুরবালা। এখন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন: কই, কেউ আছে বলে তো জানি না। আমার ননদ-নন্দাই···আপনার কাছে আর লুকিয়ে লাভ কি······আমাদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক তাঁরা রাখতেন না।

—তাই মারা যাওয়ার পর তাঁদের কেউ আছে কি না সে খোঁজটুকুও নেন নি! চমৎকার! বিরক্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন রত্নেশ্বর: আচ্ছা, আমি চলি—

—সে কি! এ বাড়িতে দয়া ক'রে পায়ের ধুলো যখন দিয়েছেন তখন একটু জল না খেয়ে—

—না, জল টল আমি কোথাও খাই না। আচ্ছা, নমস্কার—

রত্নেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে উঠলেন।

গাড়ির শব্দ গলির মোড়ে মিলিয়ে যেতেই পুরবালা একেবারে ফেটে পড়লেন: হোলোতো পাজি, নচ্ছার ছেলে-মেয়ে কোথাকার। হোলো এখন! এতোকরে বললাম, একবার পেন্নাম কর, তা কিছুতেই মাথা নোয়ালে না কেউ।

—ইশ! মাথা নোয়াবো কেন! প্রতুল ফোঁস ক'রে উঠলো।

—তা নোয়াবে কেন? বিয়ে থা করেনি, বিদেশে ব্যবসা ক'রে কতো টাকা করেছে কে জানে! ওই টাকার কাঁড়ি যখন সেই জবা হতচ্ছাড়ি পাবে তখন বুঝবে।

—বুঝবো আর কি! রেখা জবাব দিলে: জবাই যখন টাকা পাবে আমরা পেন্নাম করবো কোন্ দুঃখে।

—আরে বোকা মেয়ে! জবার খবর কি আমি দিলাম, না খোঁজ কোনো দিন ও মিনসে পাবে। তোদের ওপর একটু যদি নজর পড়ে তাই খুশী করতে চেয়েছিলাম।

—তা আগে একটু টিপে দিতে হয়। খুব খুশী করে দিতাম।

প্রতুলের হাতটান এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এতো বড়ো দাও ফস্‌কে গেল, মায়ের কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলো না, প্রতুল মনে মনে হায় হায় করতে লাগলো।

রেখা কিন্তু প্রতুলের সঙ্গে একমত নয়।

—বাবাঃ! ওই লোককে খুশী করা কি সোজা নাকি। যেন কাঠ-খোট্টা সেপাই। কথা কইছে না যেন বন্দুক ছুড়ছে।

প্রতুলের চেয়ে তার মায়ের আফশোষটা অনেক বেশী। তিনি দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন, এ কাঠখোট্টা লোকটির হৃদয় জয় করতে ছেলে-মেয়েদের দিয়ে আর কি করানো যায়। যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন: কিন্তু টাকাকড়ি বেশ আছে বলেই মনে হয়। জবা যদি ওইসব টাকা পায়!

—তা হ'লে বুক চড় চড় করে মারা যাবো। প্রতুল বললে: না বাবা, সেটি কিছুতেই হ'তে দিচ্ছি না।

ছেলের মুখে সুবুদ্ধির কথা শুনে মায়ের মুখে যেন আশার আলো পড়লো।

সাধনদের সেই বস্তিতে নগেনের যাতায়াতটা ইদানিং প্রায় নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। কারণ থাকলেও আসে, না থাকলেও আসে। কারও ঘর থেকে একখানা ভাঙ্গা টুল বা চেয়ার টেনে এনে উঠোনে বসেই এর ওর সঙ্গে গল্পগুজব করে। দৃষ্টিটা অবশ্য সাধনের ঘরের দিকেই থাকে।

কিন্তু এমন ক'রে কতোদিন আর ভালো লাগে।

সেদিন জবা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, নগেন প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো।

—এই যে, আপনাকেই খুঁজছিলাম। একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—আপনার ভাড়া তো এখনও পাওনা হয়নি।

—না, না, ভাড়ার কথা নয়। আপনি যখন আছেন তখন ভাড়ার কথা আমি ভাবি না। যখন খুশি দেবেন।

—আমার ওপর আপনার অনুগ্রহ বড় বেশী মনে হচ্ছে।

—না, না, অনুগ্রহ কি! আপনাকে তো আর এদের সঙ্গে এক দেখতে পারি না।

—পারেন না নাকি? কিন্তু এতো সূক্ষ্ম দৃষ্টি আপনার হোলো কি ক'রে?

—সে কি বলছেন! আপনি যে সাধনের আপনার কেউ নন্ সে খোঁজ আমি নিয়েছি। তা ছাড়া, চেহারা, চালচলন দেখলেও তো বোঝা যায়।

—বোঝা যায় বৈকি। কিন্তু এত খোঁজখবর, বোঝাবুঝির দরকার কি বলুন তো? আমরা ভাড়াটে, আপনি বাড়িওয়ালা এইতো সম্পর্ক।

—না, না, শুধু বাড়ীওয়ালা হিসেবে আমায় দেখবেন না।

—কি হিসেবে দেখবো?

প্রশ্নটা করেই জবা এমনভাবে চাইলো যে নগেনের মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। একটা ঢোক গিলে বললেঃ এই মানে, মানে একজন বন্ধুই মনে করুন না।

—ও! আবার তেমনি করে চাইলো জবা: বন্ধু হবার মতো সব গুণই আপনার আছে বুঝি?

রক্তস্রোত বেসামাল হয়ে উঠলো নগেনের মগজে। হাত কচলাতে কচলাতে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে: আছে কি না পরীক্ষা করেই দেখুন না।

জবা আর একবার ভাল ক'রে চাইলো নগেনের দিকে, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললে: পৃথিবীতে অনেক জিনিস পরীক্ষা ক'রে দেখবার দরকারই হয় না। ছুঁচো জাতের জানোয়ারকে অনেক দূর থেকেই চেনা যায়। শুনুন, আজ শেষবার বলে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে ভাড়া ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে আমায় জ্বালাতন করতে আসবেন না।

কাঠের নড়বড়ে সিঁড়িটা দিয়ে উপরে উঠে গেল জবা।

বলাই তার ঘর থেকে নগেনের প্রেমনিবেদনের পরিণামটা উপভোগ করছিলো। বেরিয়ে এসে বললে: কি নগেনবাবু, ঠিক জুত হোলো না মনে হচ্ছে।

কোঁচাটা অকারণে একবার ঝেড়ে নিয়ে পকেটে পুরতে পুরতে নগেন সেখান থেকে সরে পড়লো, বলাইয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে।

উপরে এসে তালা খুলে ঘরে ঢুকলো জবা।

নগেনের নোংরা মনের চেহারাটা আজ স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু শুধু নগেনের দোষ দিয়ে লাভ কি। এ বস্তির চারদিকেই তো এমনি কুশ্রী কদর্যতা। উদরান্নের সঙ্গে লড়াই আর অবসর সময় ইতরামি। তবু একটা আশ্রয়। কোথাও যাদের জায়গা নেই তারাই তো এসে এখানে জড়ো হয়! কি করবে জবা? এখান থেকে বেরিয়ে যাবেই বা কোথায়?

আকাশ-পাতাল কতো কি ভাবছিলো জবা, সাধন ঘরে ঢুকলো।

কি হোলো দিদিমণি, মনটা ভালো নেই মনে হচ্ছে। আর থাকবেই বা কি ক'রে।

—না, না, মন আমার খুব ভালো আছে। জোর করে হাসবার চেষ্টা করলো জবা।

সাধনের চোখকে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া গেলো না, একটু চুপ ক'রে থেকে

সে বললে : তোমাকে আর আমি চিনি না দিদিমণি। ভাঙবার আগে মচকাবে, তুমি কি সেই মেয়ে। কিন্তু কি ভুলই করেছি তোমায় এনে! কোনো কাজও তো এখনও কোথাও পেলে না।

—কাজ হয়তো এখনি পাওয়া যায় সাধনদা, কিন্তু যারা কাজ দিতে চায় তারা তোমার এই বাড়িওয়ালার ছেলের মতন লোক। তাদের কাছে কাজ আমি করতে পারবো না।

—না দিদিমণি, তেমন কাজ তোমায় নিতে হবে না। কিন্তু কি হবে বলতো? আমি এখনও বলছি দিদিমণি, আপনার জন যদি কোথাও থাকে, তুমি এখন অন্তত তাদের কাছে যাও। অভিমান করে থেকো না।

—কার ওপর অভিমান করবো সাধনদা? আপনার জন থাকলে কেউ অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়?

—অনাথ আশ্রমে তুমি তো কারও বাড়ি থেকেই গিয়েছিলে দিদিমণি। সে বাড়ির কথা কি তোমার মনে নেই?

—খুব মনে আছে। নেহাৎই শুনবে? শোনো। সেটা আমার মামার বাড়ি। মামা মারা গিয়েছিলেন। মামীমা আর মামাতো ভাই-বোনের অত্যাচারে আমি পালিয়ে যাই।

কৌতূহলী হয়ে উঠলো সাধন।

—এই কলকাতাতেই তাদের বাড়ি?

—হ্যাঁ, এই কলকাতাতেই। হরি সরকার লেন। মামার নামেই গলি। কিন্তু সেখানে যেন যেও না।

—না দিদিমণি, তা কখনো আমি যাই!

সাধন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো।

কোথায় কথা রাখা উচিত আর কোথায় নয়, সে সম্বন্ধে সাধনের নিজস্ব কতকগুলো নিয়ম কানুন আছে। সেই নিয়মে সে সুযোগ পাওয়া মাত্র হরি সরকারের লেনে ঢুকে পড়লো। তারপর জবার মামার বাড়িটা খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

যে খবরগুলো জানা দরকার ছিল সেগুলো চপলার কাছেই পাওয়া গেল।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এরা সেই লোকই বটে! ভুলে একবার নামও করে না। জবা দিদিমণি কি কম দুঃখে চলে গিয়েছিলো! যাক, দিদিমণি ভালো আছে এই ভালো। শুনে যে কি আনন্দ হোলো।...ওমা ভালো কথা, ভুলে যাচ্ছিলাম, দিদিমণির কাকা না কে সেদিন খোঁজ করতে এসেছিলো।

—জবা দিদির কাকা? কোথায় থাকেন গো?

—তা তো জানিনা, দিদিমণির কাকা হয় এইটুকু যেন শুনলাম।

বাইরের ঘরেই কথা হচ্ছিল। হঠাৎ মাকে সঙ্গে করে প্রতুলের আবির্ভাব।

—কি শুনলি চপলা? কাকে কি শোনানো হচ্ছে? পুরবালার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা, গলার স্বর গুরুগম্ভীর।

—না, কিছু তো শোনাইনি। এই ইনি আমাদের জবা দিদিমণির চেনা লোক্—তাই—চপলা বিব্রতভাবে কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করে।

মায়ের মুখে দুশ্চিন্তা আর বিরক্তির লক্ষণ, প্রতুল কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠলো: জবা। কোন্ জবা? আমাদের সেই জবা?

সাধন খুশী মনে ঘাড় নাড়লে।

—আরে, আমি তো ভেবেছি কবে সে টেঁসে গেছে!...কোথায় আছে বলো তো?

—আজ্ঞে, ৬ নম্বর বংশী মিস্ত্রীর লেন—

—বংশী মিস্ত্রীর লেন?......আরে, সেটা তো একটা বস্তিপাড়া।

—বস্তিপাড়ায় থাকবে না তো কি রাজবাড়িতে থাকবে। ঝঙ্কার দিলেন প্রতুলের মা: গুবরে পোকা কি গোলাপ ফুলে থাকে! তা এতদিন বাদে আবার লোক পাঠিয়েছে কেন? আবার এ বাড়িতে ঢোকবার মতলব বুঝি? সে গুড়ে বালি বলে দিও—

—আজ্ঞে তা তিনি জানেন।

বলতে বলতে সাধন সেখান থেকে সরে পড়লো। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে তার সময় লাগলো না আর।

প্রতুলের মার সব রাগ গিয়ে পড়লো এবার চপলার ওপর।

—তোকে বাঁরণ করে দিচ্ছি চপলা, যার তার কাছে এ বাড়ির কোনো কথা বলেছিস তো মজা দেখবি।

প্রতুল কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতেই লাগলো। বংশী মিস্ত্রীর লেন। মোটেই দূর নয় এখান থেকে। এতোদিনে জবার বিয়ে হয়েছে নিশ্চয়। না হলে, চাকরি-বাকরি একটা করে অন্তত। নইলে চলে কি করে? একবার গিয়ে দেখলেই বা ক্ষতিটা কি? অবস্থা যদি গোছালো দেখা যায় তা হ'লে ক্ষতির বদলে লাভই কি আর কিছু হ'তে পারে না?

দেখাই যাক না চেষ্টা ক'রে।

বাসায় ফিরে সাধন কিন্তু হরি সরকার লেনের রিপোর্টটা দিতে দেরি করলো না। জবা গম্ভীর হোলো আরও।

—এতো করে বারণ করলাম তবু তুমি সেখানে গেলে কেন বলোতো সাধনদা!

—যাওয়া আমার খুব অন্যায় হয়েছে দিদিমণি, কিন্তু না গেলে তোমার কাকার খবরটা তো পেতাম না!

—আমার কাকা বলছো!…কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!

—একবার সেখানে গিয়েই দেখো না দিদিমণি। তাতে কোনো দোষ নেই! জবা ভাবতে লাগলো। তার কাকা বলে কেউ যে আছেন বা থাকতে পারেন এমন কথা সে মামা-মামী কারও মুখেই কোনো দিন শোনেনি, অন্তত তার মনে পড়ে না। কিন্তু সত্যই যদি তিনি বিদেশ থেকে এতকাল পরে খোঁজ করতে এসে থাকেন, তারও কি উচিত নয় মামীমার সঙ্গে দেখা করে প্রকৃত ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করা? সত্যি এতে দোষই বা কি! অন্তত চপলাদিদির সঙ্গেও একবার দেখা হবে।

যাওয়াই ঠিক করলো জবা।

সেই বৈঠকখানা। আলমারি থেকে ছবির বই বার ক'রে দেখতে গিয়ে লাঞ্ছনার অবধি ছিল না যেখানে। দরজাটা খোলা, চপলাই ঘরের ভিতর ঝাড়া মোছা করছে। চোখে চশমা, হাতে ভ্যানিটী, জবা ভিতরে এসে দাঁড়ালো।

বেলা পড়ে এসেছিল। ঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার। চিনতে পারলো না চপলা। বিব্রতভাবে বললেঃ কাকে চাই?

—তোমাকেই চাই মনে হচ্ছে! হাসলো জবা।

—আমাকে!

আশ্চর্য হয়ে চপলা স্যুইচ টিপে আলো জ্বাললো।

—ওমা, আমাদের ছোট দিদিমণি!

চপলা আনন্দে উথলে উঠলো যেন।

—আমি চিনতেই পারিনি! জড়িয়ে ধরলে একেবারে বুকের মধ্যে, তখুনি পিছিয়ে গিয়ে বললে: এই ত্যাখো দিদিমণি, কি করলাম, তোমার ভালো জামাকাপড় সব নষ্ট হয়ে গেল!

—তা হয়তো হোলো। হাসতে হাসতে বললো জবাঃ কিন্তু জামা কাপড়ের দাম কি তোমার আদরের চেয়ে বেশী? কতদিন যে তোমার জন্যে মন কেমন করেছে!

—এই দেখো দিদিমণি, ওসব কথা শুনলে আমার কান্না পায়। আমার জন্যে তোমার মন কেমন করবে কোন্ দুঃখে? এদের ভয়ে তোমায় কি কোনোদিন একটু যত্নআত্তি করতে পেরেছি। মাইনেকরা ঝি। ওদের হুকুম মতো তোমায় কষ্টই দিয়েছি কতো!

—না চপলাদি, মুখে তুমি বকেছো, মন থেকে নয়। তোমার চোখ দেখেই টের পেয়েছি। মনের ভালোবাসা চোখে তো লুকোনো যায় না। তা তুমি ভালো আছো তো?

—এমনি তো ভালই আছি দিদিমণি। ওনার এখন মটোরের কারখানায় মাইনে বেড়েছে। তবে এদের কাজ আর বোধ হয় করতে পারবো নি। বলে পেটে খেলে পিঠে সয়। তা পেটেও খেতে পাব না, আবার পিঠের

ঘাও সইতে হবে, এ আর কতদিন চলে! সাত মাস মাইনে বাকি, তাও যদি মুখের দুটো মিষ্টি কথা শুনতাম, তা হলেও দুঃখু ছিল না—

চপলার কথা শেষ হবার আগেই ভিতর থেকে রেখার গলা শোনা যায়ঃ ভাল হবে না বলছি দাদা, আমার আংটি নিও না।

—ওটা কি হচ্ছে প্রতুল! সব তো উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছ, মেয়েটার আংটিটা আবার টান মেরে নিয়ে যাচ্ছ! এবার গলার স্বরটা এ বাড়ির গৃহিণীর।

—আরে বলছি তো ফিরিয়ে এনে দেব। এইরকম একটা আংটি আমার বন্ধুর বোনের জন্য গড়াতে দেব কি না।

বলতে বলতেই শ্রীমান প্রতুলের বৈঠকখানায় প্রবেশ। পিছনে পিছনে রেখা আর তার মা।

রেখা ঝাঁঝিয়ে উঠলঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওসব ধাপ্পা তোমার অনেক শুনেছি। এখুনি নিয়ে গিয়ে বাঁধা দেবে কি করবে তা আর জানিনা! পুরবালা বললেনঃ দিয়ে দাও বলছি ওর আংটি প্রতুল, হাড় আমার এমনিতে ভাজা ভাজা হয়ে আছে—

সেই ভাজা ভাজা হাড় নিয়েই হঠাৎ জবাকে আবিষ্কার করে ফেললেন। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তখনই সামনে নিয়ে বললেন, কে গো আমাদের জবা না?

—হ্যাঁ মাইমা। উত্তরটা জবাই দিলে।

মার চেয়ে প্রতুলই যেন বেশী অবাক হয়ে গেল।

—আরে তাইত মাইরী! তোকে যে চেনাই যায় না! জবার সর্বাঙ্গে চোখ বুলোতে বুলোতে বললেঃ চেহারা একেবারে বদলে ফেলেছিস দেখছি!

—সাজ গোজটাও একবার দেখ! রেখা মনের জ্বালাটা লুকোতে পারলো না।

পুরবালা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেনঃ দেখেছি। তা মামির কাছে এতদিন বাদে আবার কি মনে করে? একটা কিছু মতলব না নিয়ে তো আর

আসনি বাছা। নইলে খাইয়ে পরিয়ে যে মানুষ করলো এতদিনে তার একটা খোঁজও নিতে নেই!

—খোঁজ নিয়েছি মাইমা, তবে আসতে সাহস হয় নি।

—তা আজ সাহসটা হল কি করে?

—শুনলাম আমার একজন কাকা নাকি তোমাদের এখানে এসেছিলেন। আমার কাকা যে বেঁচে আছেন জানতাম না। তাই তাঁর ঠিকানাটা যদি—

—শোন কথা! তোমার আবার কাকা কে গো! আর তার খবর আমরা জানব কোথেকে!

সমস্ত ব্যাপারটাই উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন পুরবালা, চপলাই গণ্ডগোল বাধালে।

—ওই যে সেদিন একজন এসেছিলেন—

কথাটা চপলাকে শেষ করতে হলো না। পুরবালা একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে ধমকে উঠলেন: তুই থাম দেখি চপলা। এসব কথায় তুই ফোঁড়ন পাড়তে আসিস কেন বল দেখি? যা নিজের কাজে যা—

চপলাকে মাথা হেট করে সরে যেতে হল।

—কাকার খবর কোথা থেকে পেয়েছে জিজ্ঞাসা কর তো মা! এবার আসরে নামলো রেখা।

জবা বললে, যেখানেই পেয়ে থাকি, ভুল খবর পেয়েছি বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—

সত্যি যাবার জন্যে পা বাড়াল জবা।

—কি রে চল্লি নাকি? প্রতুল জিজ্ঞাসা করলে।

—হ্যাঁ।

প্রতুলের মগজে যেন চট করে বুদ্ধির একটা ঢেউ খেলে গেল। জবার সামনে গিয়ে বললে, খুব তো হাতে ব্যাগ ঝুলিয়েছিস! মাল কিছু আছে? কুড়িটা টাকা ধার দেত দেখি?

কী নির্লজ্জ!

রেখা ডাকলো : দাদা—

পুরবালা ধমকালেন : প্রতুল—

প্রতুল কিন্তু এসব ব্যাপারে ঠুনকো মান-অপমানের রেওয়াজ মেনে চলতে নারাজ। অমায়িক হাসির সঙ্গে বললো : আরে তাতে দোষ হয়েছে কি! মাষ্টারনি হয়ে ভাল রোজগার করছে, আর মামাত ভাইকে কুড়িটা টাকা ধার দিতে পারে না! কই দে—

পাওনার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল প্রতুল। জবা ওর দিকে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ছুড়ে মারলো, তারপর ব্যাগ খুলে দুখানা দশ টাকার নোট তার হাতের ওপর ফেলে দিল।

আরও অবাক হয়ে গেল প্রতুল। যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

—আরে, চাইতেই ঝট করে দিয়ে ফেললি যে! আরও একটু বেশী করে চাইলেই তো হ'ত তাহলে।···আচ্ছা আজ থাক, তোর ঠিকানাটা বলে যা'ত, মাঝে মাঝে যাব'খন।

—না, সেখানে গিয়ে তোমার দরকার নেই। জবা বেশ স্পষ্ট করেই জানাল : কোন লাভ হবে না। আজ যা পেলে তাই শেষ। পৃথিবী যে কিরকম নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর তা তোমাদের কাছেই শিখেছিলাম। তাই কিছু গুরুদক্ষিণা দিয়ে গেলাম।

—ইশ! কুড়িটা টাকা ধার দিয়ে খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনাচ্ছিস! থুতু ফেলি তোর টাকায়—নিয়ে নে তোর টাকা!

প্রতুলের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল সত্যিই বুঝি সে টাকা এখুনি ফেরৎ দিয়ে দেবে। কিন্তু হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই, এই প্রচলনটি বোধ হয় মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্বর বদলাল প্রতুল : নাঃ, তোকেই বা দেব কেন! রাস্তায় ফেলে দেবো টাকা, রাস্তায় ফেলে দেবো—

এ বাড়ির সমস্ত কুৎসিত চেহারাটা যেন মুহূর্তের মধ্যে জবার চোখের সামনে নতুন করে জেগে উঠলো। ছোট মন আর প্রকাণ্ড লোভ!···

আজও তার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। জবা আর সেখানে দাঁড়াতে পারলো না।

জবা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরবালা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে জরুরী পরামর্শ করতে বসলেন। উঁহু, এসব ভালো কথা নয়। কাকার খবর যখন একবার পেয়েছে জবা, তখন তাঁদের আর চুপ করে বসে থাকা ভালো নয়। কবে কোথায় দেখাই হয়ে যায়, তার ঠিক কি!

অনেকক্ষণ ধরে মন্ত্রণাসভার বৈঠক চললো।

সেইদিন বিকেলের দিকেই প্রতুল আর রেখাকে দেখা গেল রত্নেশ্বর মুখুজ্যের বাসা বাড়ির বসবার ঘরে। সাজান-গুছানো ঘরটা খালি। দরজা খোলা পেয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই ঢুকে পড়েছে দুটিতে।

প্রতুল এদিক ওদিক চাইতে চাইতে বলেঃ কিরে, কাউকে তো দেখছি না, কেউ কোথাও নেই নাকি। আমাদের হায়রানিই সার! খালি বাড়ি দেখেই ফিরে যেতে হবে নাকি!

—খালি বাড়ি হবে কেন? রেখা সাহস জোগায় ভাইকেঃ তা হলে ঘর কখনও খোলা থাকে! না এমন সাজান হয়? পাশের ঘরেই গেছেন বোধ হয়। এখুনি আসবেন।

—আসবেন তো বুঝলাম। কিন্তু কে আসবেন তাইতো ভাবছি। সেই উকীল ব্যাটা যদি ধাপ্পা দিয়ে থাকে? যা তা ঠিকানা দিয়ে কার না কার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে কে জানে? দরকার নেই বাবা আমার সম্পত্তির লোভে, মানে মানে সরে পড়ি—

—কি পাগলামি করছ দাদা বলত! আমাদের ভুল ঠিকানা দিয়ে সে উকীলের লাভ? রেখা বলেঃ আমি মেয়েছেলে সাহস করে দাঁড়িয়ে আছি আর মদ্দ ব্যাটাছেলে হয়ে তুমি ভয় পাচ্ছ।

—আরে মদ্দ ব্যাটাছেলে বলেই তো ভয়। তুই 'ট্রেসপাশ' করলে খুশী না হক, ঘুষি তো কেউ মারবে না। মার-ধর, প্যাঁদানি যে শুধু এই মদ্দ ব্যাটাছেলেরই বেলায়—

রেখা ঠিকই বলেছিলো, প্রতুলের কথা শেষ হবার আগেই রত্নেশ্বর

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মুখে পাইপ, গায়ে ঢিলে পাজামার ওপর দামী একখানা আলোয়ান!

—ভাইবোনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিলো।

—আমাদের চিনতে পারছেন না বোধ হয়? প্রতুল সবিনয়ে বললো।

—খুব চিনতে পেরেছি। তোমাদের মতো দুটি রত্নকে একবার দেখলে কি আর ভোলা যায়। রত্নেশ্বরের গলার স্বরটা ঠিক প্রসন্ন মনে হ'ল না। রেখা কিন্তু ঘাবড়ালো না। মা যেমন বলে দিয়েছিলেন, তেমনি কুণ্ঠিত ভাবে বললো: আমাদের ব্যবহারে সেদিন কি মনে করেছেন কে জানে।

—মানে, ব্যাপার কি জানেন, নতুন লোকের সামনে আমাদের কেমন বড় লজ্জা করে। তাই তখন আপনাকে প্রণাম করতে পারিনি। সসঙ্কোচ হাসির সঙ্গে পাদপূরণ করল প্রতুল।

—ও! সেই ভুল শোধরাতেই এতদূর এলে বুঝি—? মা-ই পাঠিয়ে দিলেন বোধ হয়?

প্রতুল বিব্রত হয়ে রেখার দিকে চাইলো। রেখা তাড়াতাড়ি সামলাবার চেষ্টা করলো: না, মা পাঠাবেন কেন! এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম—

—কিন্তু আমি যে এখানে থাকি তা জানলে কি করে? আমার ঠিকানা তোমাদের দিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না?

—না, না, ঠিকানা, মানে—ঘাবড়ে গেল প্রতুল: বল্ না রেখা, ঠিকানা যেন—

রেখা কিন্তু একেবারে অন্য পথ ধরলে।

—অত কৈফিয়ৎ দেবার দরকার কি! আপনার এখানে আসা অন্যায় মনে করেন, আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি। এসো দাদা—

—দাঁড়াও, এত কষ্ট করে আমার বাড়ি খুঁজে যখন এসেছ একটু মিষ্টি-মুখ করে যাও—

—না, যা মিষ্টি কথা শুনিয়েছেন তারপর মিষ্টি মুখ না করলেও চলবে। এস দাদা।

প্রতুল অতটা শক্ত হতে পারলো না। বললে, দুর বোকা কোথাকার, কোথায় যাবি এখন? উনি যখন এত করে বলছেন তখন কিছু না খেয়ে যেতে আছে?

—এই অপমানের পরও থাকবে?

—অপমান! অপমান আবার কিসের! উনি গুরুজন, আপনার লোক, যদি একটু শাসন করেন কি দু ঘা মারেনই, তাতে বুঝি অপমান হয়! আয় বোস—

—বেশ বসছি, কিন্তু আর কখনও যদি তোমার সঙ্গে কোথাও যাই—

রেখার জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো প্রতুল। তারপর চেষ্টা করলো রত্নেশ্বরের সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ হবার।

—আচ্ছা, আপনি তো আমাদের পিসেমশাইয়ের ভাই হন। আপনাকে কি বলে ডাকব বলুন তো?

রত্নেশ্বর জবাব দিলেন: ডাকবার বিশেষ দরকার হবে মনে হচ্ছে না। আমি দু'দিন বাদেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। আচ্ছা, বোস তোমরা, জল খেয়ে যাবে—

রত্নেশ্বর ভিতরে চলে গেলেন। ভাই-বোনে এ-ওর মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে রইলো। ছি, ছি, মায়ের কি দুর্বুদ্ধি। মনে মনে ভাবলো প্রতুল! ঠিকানাটা জোগাড় করতে তাকে কি মেহনত না করতে হয়েছে। কিন্তু সুবিধেটা হল কি? কয়েকটা টাকাও যে কোনো দিন ধার পাওয়া যাবে সে আশাও রইলো না!

নিখরচায় জলযোগটাই যা লাভ।

শরীরটা কদিন থেকেই ভালো যাচ্ছে না। মনটাও ভালো নেই! তবু নিজের জামাকাপড়গুলো নিজেকেই কেচে নিতে হয় আর, বস্তির সেই বারোয়ারি কলতলার মাঝখানে বসেই। এতে কোনো অসুবিধে ছিল না জবার, ছোট বয়স থেকেই মামীমা পুরবালার শাসন আর মেট্রন চারুশীলার 'ডিসিপ্লিনের' দৌলতে এগুলো অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু এখানকার এই

অনভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে শরীরের সঙ্গে মনটাও যেন ভেঙে পড়তে চায়। সাবান কাচতে কাচতে জবা যেন হাতখানা নাড়তেই পারছিল না।

বলাইয়ের বোন পুঁটি জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে গো? শরীর খারাপ?

—না, ওকিছু নয়। এড়াবার চেষ্টা করলো জবা।

—বাড়িওয়ালা যে তোমাদের ঘরে তালা দিচ্ছে!

—তালা দিচ্ছে।

জবা আশ্চর্য হয়ে ঘরের দিকে তাকাল। সত্যিই তাই। নগেন ওঁদের ঘরের দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলিয়ে হন্ হন্ করে নেমে আসছে।

—আপনি আমাদের ঘরে তালা দিচ্ছেন? কলতলা থেকে উঠে গিয়ে জবা একেবারে নগেনের মুখোমুখি হোলো।

—হ্যাঁ, দিয়েছি।

—কেন, আমাদের ঘরে আপনি তালা দেবার কে?

—কে তা আদালতে গেলেই জবাব পাবে। এটা তো অতিথিশালা নয়। ভাড়া দিতে না পারলে এখানে তালা বন্ধই হয়।

চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠলো জবার। অসুস্থ শরীরটা উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো একবার। কি করে ফেলতো কে জানে, সাধন এসে পড়লো ঠিক সেই সময়। পিছনে পিছনে বলাই এবং আরও জনকয়েক।

—কি হয়েছে কি?

জবা নিরুত্তর। সাধন জবার গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলো: একি দিদি, তোমার গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! কি হয়েছে বলোতো?

—না, এমন কিছু নয়। নগেনবাবু আমাদের ঘরে তালা দিয়েছেন। এখানে আর আমাদের থাকা চলবে না।

—কিন্তু তোমার যে জ্বর দিদি—

—তা হোক, যেখানে হোক আমায় নিয়ে চলো।

মহা বিপদে পড়লো সাধন। হাতে একটি পয়সা নেই। এ মেয়েকে নিয়ে যাবে কোথায়?

বলাই বললে, না, না, কোথাও যেতে হবে না। বাড়িওয়ালা বলে অনেক জুলুম এতদিন সহ্য করেছি, আর না। শোন, নগেনবাবু সাধনদার ঘরের তালা খুলে দেবে কি না?

বলাইয়ের ছোটভাই সিধুও যোগ দিলে: ভদ্দর লোকের মেয়ে জ্বরের ঘোরে দাঁড়াতে পারছে না, আর তুমি কি না এত বড় চামার, দরজায় তালা দিয়ে রেখেছ।

—মুখ সামলে কথা বলবে! নগেন ঝাঁঝিয়ে ওঠে: দরজায় তালা দেবো না তো কি ঘরে বসিয়ে পূজো করবো! চার মাসের ভাড়া বাকি তা জান!

—ভাড়া বাকি! ভাড়া বাকির জন্যে তুমি এই জুলুম করছ? আমরা যেন আর কিছু জানি না! বলাই এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গলো: এ বাড়িতে ঢোকা অবধি তুমি ওঁর পিছনে লেগেছ! তারপর মুখের মতো জুতো খেয়ে এখন বিষদাঁত বার করে কামড়াতে এসেছ! এখনও বলছি ভালোয় ভালোয় চাবিটা দিয়ে দাও—

নগেন ঘাবড়ে গেল। বলাই ডাকাবুকো কাঠ গোঁয়ার, কাউকে খাতির করে না। এখন আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। ঝনাৎ করে চাবিটা উঠোনে ফেলে দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললে: আচ্ছা আমিও এর শোধ নিতে পারি কি না দেখে নিও—

—তা নিও, কিন্তু এখন থেকে এ বস্তি-বাড়ির ভেতর পা দিয়েছ কি ঠ্যাং দুটো রেখে যেতে হবে মনে রেখো। বলাই জানালো: ভাড়া এখন থেকে ওই বাইরে দাঁড়িয়ে নিয়ে যাবে—

নগেন আর দাঁড়ালো না। সিধু, বলাই ওরাই গিয়ে সাধনের ঘরের তালা খুলে দিলো।

রাত্রে জবার জ্বরটা কিন্তু ভয়ঙ্কর রকম বেড়ে গেল! সাধন মাথায় জলপটি দিয়ে বসে বসে বাতাস করতে লাগলো, কিন্তু জ্বর আর কমে না। আকাশ পাতাল কত কি ভাবলো বসে বসে। কি করা যায়? ওষুধই বা পায় কোথায় আর ডাক্তারই বা ডাকা যায় কি করে? হঠাৎ আশ্রমের

অজয় ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল। তাকে খবর দিলে কেমন হয়? কিন্তু খবর পেলেই কি আসবে? কতদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! রাত ন'টা নাগাদ জবা ঘুমিয়ে পড়তে, পুঁটিকে ডেকে জবার কাছে রেখে সাধন পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল।

তারপর একেবারে অজয় ডাক্তারের কাছে। অজয় শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু সাধনের নাম শুনেই উঠে এসে দেখা করলে এবং তার কাছে জবার সমস্ত খবর পেয়ে বললে: ভাবনার কিছু নেই সাধন, আমি কাল সকালে গিয়ে নিশ্চয়ই দেখে আসবো।

কথা রাখলো ডাক্তার।

—কে এসেছেন দেখ দিদিমণি—

সাধনের ডাকে চোখ মেলে চাইল জবা—সাধনের দিক থেকে অজয়ের দিকে। জ্বরের ঘোর তখনও পূরো মাত্রায়।

—চিনতে পারছেন না? আমাদের আশ্রমের ডাক্তারবাবু—সাধন আবার বললে।

—চিনতে পেরেছি, কিন্তু ওঁকে কেন নিয়ে এলে? জবা ক্লান্তভাবে চোখ বুঁজলো।

অজয় জবার পাশটিতে বসে তার হাতখানা ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে লাগলো। তারপর হাসতে হাসতে বললে: বাঃ, চমৎকার! আমায় নিয়ে আসাও অন্যায় হয়েছে বুঝি? কিন্তু এ আপনি কি করছেন বলুন তো? কার ওপর অভিমান করে নিজের ওপর শোধ নিচ্ছেন?

—নিজের ওপর শোধ নিচ্ছি কে বললে? যা আমার নিয়তি তাইত হবে। আর অভিমানই বা করবো কেন? অভিমান করবার মতো কেউত আমার নেই।

—তা বলবেন বই কি! হয় আপনি অন্ধ, নয়ত মন বলে আপনার কিছু নেই। অজয়ের গলার স্বরটা যেন ধরা ধরা মনে হ'ল: আমার কথা ছেড়ে দিন। বাবার অবস্থা কি হয়েছে ভাবতে পারেন? তাঁর নিজের ছেলে মেয়ে কেউ মারা গেলেও তিনি বোধ হয় এত ভেঙ্গে পড়তেন না।

—তাকে বেশী দুঃখু দিতে চাই না বলেই আমি চলে এসেছি।

—এ আপনার যোগ্য কথাই হয়েছে। যাক, এসব আপনাকে বলা বৃথা। আমি ডাক্তার হিসেবেই এসেছি, ডাক্তার হিসেবেই আপনাকে দেখে যাবো। আশা করি তাতে কোন আপত্তি নেই ?

কথাটার ভেতর খোঁচা ছিল, জবা একটু বিস্মিত হয়ে চুপ করে অজয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। শুধু ডাক্তার ? হ্যাঁ, শুধুই ডাক্তার। তার কাছে আর কোন পরিচয় অজয়ের থাকতে পারে না।

—নাঃ, আপত্তি আর কি ! বেশ কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিল জবা : শোভাকেও আপনি দেখেছিলেন, আমাকেও দেখুন।

—শোভা ! সেই শোভা ! মরে গিয়েও সে আপনার মনের দরজা আগলে বসে আছে !

—হ্যাঁ আছে। তাকে ভুলতে আমি পারব না, ভুলতে আমি চাই না।

—মাপ করবেন, আমার বলাই অন্যায় হয়েছে। ষ্টেথসকোপটা বার করে অজয় বললো : একটু পাশ ফিরে শোন্। পিঠটা দেখবো।

পরীক্ষা এবং প্রেসক্রিপশান লেখা শেষ করে অজয় বললো, তুমি আমার সঙ্গে এস সাধনদা, ওষুধ দিয়ে কি করতে হবে বলে দিচ্ছি—ঘরের বাইরে এসে সাধন জিজ্ঞাসা করে, কিছু কি ভয় আছে ডাক্তারবাবু ?

—সব তুমি বুঝবে না সাধনদা, তবে ভয় আছে। বুকে সর্দি বসেছে, নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। আচ্ছা তুমি এস—

অজয় নড়বড়ে সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গেল। সাধন আবার ঘরে ঢুকে বললে : তুমি একটু একা থাকতে পারবে দিদিমণি ? আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে আসি। নিচে থেকে আমি বরং কাউকে ডেকে দিয়ে যাই।

—না, না, কাউকে ডাকতে হবে না। তুমি যাও।

—আমি যাব আর আসব দিদিমণি, কিচ্ছু দেরী হবে না।

সাধন চলে গেল। জবা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ঘরের ময়লা, অন্ধকার দেয়ালটার দিকে। মাঠকোঠার ঘর। দেয়ালের চুণ বালি খসে পড়েছে—

ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে দরজা জানালাগুলো। নিচের কলতলা থেকে হট্টগোল শোনা যাচ্ছে—কে আগে জল নেবে তারই জন্যে লাইন দেওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি। ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না। অজয়-বাবুকে কথাগুলো বলে ফেলে মনটা যেন আরও খারাপ লাগছে। কিন্তু অন্যায়ই বা সে কি করেছে। পুরুষদের ভালোবাসা যে কত ঠুনকো, কত বড় ভুল সে কথা কি শোভা তাকে বার বার বলে যায়নি? ভালোবেসে বিয়ে করে তার মাকে কি দুর্গতিতেই পড়তে হয়েছিল সে কথাও তো জবা শোভার মুখেই শুনেছে। তারপরেও ভালবাসার স্বপ্ন? পাগল আর কি!

কিন্তু জবা কি সত্যিই স্বপ্ন দেখছে নাকি? নির্জন ঘরখানার ওই অন্ধকার কোনটায় কে যেন কখন চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়ে আছে।

—আমার কথা মনে আছে জবা?

ঠিক যেন শোভার গলার আওয়াজ, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। চমকে উঠলো জবা। জ্বরের ঘোরে বিকার সুরু হলো নাকি? কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? শোভাকে তার মনে আছে কি না তাও আজ প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে! তবে কার জন্যে আজ ডাক্তারকে সে এমন করে ফিরিয়ে দিল?

—নিজের মনকে ছলনা করিস না জবা। সব স্মৃতিই একদিন ফিকে হয়ে আসে, মনে আবার নতুন রং লাগে। এই পৃথিবীর নিয়ম। সেদিনের শপথ আজ কি শান্তি হয়ে উঠছে না?

—না, না, সে শপথ আমি রাখবই, সারা জীবন রাখব।

—আর রাখতে হবে না। শোভার কুয়াশা-ঘেরা মুখে যেন ব্যঙ্গের ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো: তোর শপথ থেকে আমি তোকে মুক্তি দিলাম।

—কেন? কেন? কি করেছি আমি?

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে জবা ঘরের সেই কোণটায় চেয়ে রইলো। কিন্তু কেউ নেই সেখানে। দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে লম্বা একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে শুধু। তা হলে, জবা এতক্ষণ কথা কইলো কার সঙ্গে? নিজের মনের সঙ্গে নয়ত?

—শোভা! শোভা! শোভা! আর্তকণ্ঠে ডাকলো জবা। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে।

জ্বরটা বুঝি ছাড়বার মুখে এলো।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলের হাতটান এবং আবদারের নামে উপদ্রব দুটোই সমান মাত্রায় বেড়ে চলেছিল। সেদিন ব্যাপারটা হঠাৎ আরও ঘোরাল হয়ে উঠলো। পুরবালা কুটনো কুটছিলেন, প্রতুল এসে গোটা পঞ্চাশ টাকার জন্যে ঝুলোঝুলি স্বরু করে দিল। কয়েকটা দেনা না মিটোলে রাস্তায় হাঁটা ভার হয়েছে নাকি। পুরবালারও ধনুর্ভঙ্গ পণ, টাকা এখন দিতে পারবেন না।

ছেলে ক্ষেপে উঠলো।

—টাকা তাহলে দেবে না?

—না, না, না। কোথায় পাব টাকা! লুটে পুটে নিয়ে আর আমার কি কিছু রেখেছ? এত বড় জোয়ান মদ্দ হয়েছ, নিজে রোজগার করতে পার না!

—কি করে পারব! তেমন করে কি মানুষ করেছ?

—ওঃ, এখন আমারই সব দোষ! তাত হবেই। বেশ, আমার কাছে আর একটি কাণাকড়ি পাবে না।

—আচ্ছা না পাই, আমার অন্য ব্যবস্থা আছে, ৬নং বংশী মিস্ত্রীর গলি—

অর্থাৎ জবাদের বস্তি। পুরবালা তাই মনে করে প্রায় আঁতকে উঠলেন! প্রতুল কিন্তু হাসতে হাসতে বললে : সেখানে যাব কেন! যেখানে এ ঠিকানাব দাম আছে সেখানেই যাবো!

কী সর্বনেশে ছেলে মা! পুরবালার মুখ শুকিয়ে গেল। কত করে রত্নেশ্বরের কাছে জবার কথাটা তিনি লুকিয়ে রেখেছেন, আর হাতভাগা ছেলে কিনা—

পুরবালা ধমকে উঠলেন : খবরদার বলছি প্রতুল। খবরদার তুমি ও ঠিকানা সেখানে জানাতে পারবে না।

—কেন পারব না ! প্রতুল মুখের একটা ভঙ্গী করে বললে : ওঃ ! জবা বড় মানুষ হবে ভেবেই বুক চড় চড় করে উঠছে বুঝি ! আমার বাবা অত হিংসে নেই। আমাদের যখন কস্মিনকালে কিছু দেবেই না, তখন জবাই পাক না কেন। তবু ছিটেফোঁটা তো জুটবে। বিয়ে যখন হবেই না, তখন বরযাত্রীই বা মন্দ কি !

প্রতুল দৃপ্ত পদক্ষেপে প্রস্থানোদ্যত হতেই পুরবালা চেঁচিয়ে উঠলেন : প্রতুল—

—কেন মিছিমিছি পেছু ডাকছ। আমি যাবই। বলতে বলতে প্রতুল বেরিয়ে গেল।

বদ মতলব একটা গড়ে উঠলে সেটা কাজে খাটাতে দেরী করা প্রতুলের দস্তুর নয়। রত্নেশ্বরের বাসায় এসে সটান তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললে : আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কি কথা ?

—আপনি আপনার ভাইঝিকে খুঁজছেন তো। কেউ খোঁজ দিতে পারলে পুরস্কার দেবেন ?

—তা দেব। কিন্তু তার খোঁজ তোমরা জানবে কি করে? তোমার মা ত সেদিন বললেন কিছুই জানেন না।

—আঁজ্ঞে, মা একটু ভুল বলেছেন।

—ভুল বলেছেন ! তার মানে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলেছেন বল।

—আঁজ্ঞে হাজার হক মা'ত ! মিথ্যে বলেছেন কি করে বলি ! অপ্রতিভ একটু হাসি মিলিয়ে প্রতুল জানাল : জবা আমাদের বাড়িতেই ছিল।

—জবা !···ও তার নাম বুঝি জবা ! রত্নেশ্বর কৌতূহলী হয়ে উঠলেন : তোমাদের বাড়িতেই সে ছিল ! কবে ?

—সে অনেক দিন আগে।

—অনেক দিন আগে ! তার মানে তাকে বিদেয় করেছ সবাই মিলে। রত্নেশ্বর ধমকে উঠলেন : এই খবর দিয়ে তুমি পুরস্কার নিতে এসেছ !

—আজ্ঞে না, এখন সে কোথায় আছে তাও জানি। প্রতুল বললে: আমায় কিন্তু নগদ একশ টাকা দিতে হবে।

—একশর বদলে তোমায় পাঁচশ টাকা দেবো। কিন্তু আর যদি সত্যি না হয় কি হবে বুঝতে পারছো?

—আজ্ঞে তা একটু পারছি। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে প্রতুল বলে: এতেই তার এখানকার ঠিকানা পাবেন, আমি লিখে এনেছি।

প্রতুলের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে রত্নেশ্বর সন্দিগ্ধভাবে পড়তে লাগলেন। প্রতুল ভয়ে ভয়ে বললে: আমার টাকাটা—

রত্নেশ্বর বললেন, হবে, হবে। আগে দেখে আসতে দাও।

জবা চলে যাবার পর, মহেন্দ্রপ্রতাপের উপদ্রব সরোজিনীকেই সামলাতে হচ্ছিল। আগে ছিল সকলের ওপর রাগ, এখন দাঁড়িয়েছে বাড়ি শুদ্ধ সকলের কাছে অভিমান! কিন্তু আর কেউ সহজে ধারে-কাছে ঘেঁষে না, ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা সব কিছু সরোজিনীকেই পোয়াতে হয়।

সকাল বেলায় স্নান সেরে আহ্নিকে বসতে যাবেন সরোজিনী, ভাইটি ঘরে এসে হাজির।

—একে নেমক হারামি বলে কি না তুই বল সরো। না বলে কয়ে সেই যে চলে গেল, এতদিন কোথায় আছে, কি করছে না করছে তার একটা খবর পর্যন্ত দিতে নেই?

এ রকম প্রশ্ন এর আগেও উঠেছে অনেকবার। সরোজিনী চুপ করে রইলেন।

—কেন, খবর দিলে আমি কি জোর করে ধরে আনতাম? চাকরি করতে এসেছিলি, পোষায়নি—চলে গেছলি তাতে আমার কি! অমন কত আসে যায়, আমার তো ভালোই—কি বলিস?

সরোজিনী তবু কিছু বললেন না।

—চুপ করে আছিস যে? কথার উত্তর দিতে পারিস না!

—কি উত্তর দেবো দাদা!

—কি উত্তর দেব! কেন? সে চলে গিয়ে আমার ভালো হয় নি?

—হয়েছে বোধ হয়।

—বোধ হয়! মহেন্দ্রপ্রতাপ কণ্ঠস্বর আর একটু চড়িয়ে দিলেন: আমার অমন মিথ্যে মায়া টায়া নেই। আমি কিন্তু ইচ্ছে করলে ওকে দস্তুর মতো শিক্ষা দিতে পারি, রীতিমতো জব্দ করে দিতে পারি, বুঝেছিস?

—কি করে দাদা?

—কেন! আমি যদি বলি আমায় দেখা শোনা করবার জন্যে আনিয়েছিলাম, না বলে কয়ে কাজ ফেলে চলে যাওয়ার দরুণ আমার আবার শরীর খারাপ হয়েছে, পুলিশ কিছু করবে না ভেবেছিস? ঠিক হুলিয়া বার করে ধরে আনবে।

তবু সরোজিনীর পক্ষে থেকে কোনোরকম সমর্থন বা উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেল না।

মহেন্দ্রই আবার বললেন: আচ্ছা, আমার কাছে মাইনে তো বাকি আছে। আসুক না একবার মাইনে নিতে। একটি পয়সা দেব না।

সরোজিনী বললেন: মাইনের ওপর তার লোভ আছে বলে তো মনে হয় না দাদা।

—লোভ নেই! ওঃ! লোভ নেই তো বয়েই গেল আমার। আমিও এখন থেকে যা খুশি অত্যাচার করবো দেখিস। যা খুশি কুপথ্যি তাই করবো। ডাক তুই ঠাকুরকে—

সরোজিনীর হাসিও পেল, চোখে জলও এল। মনে মনে বললেন: সে হতভাগী কি এখানে আছে যে তোমার এই ছেলেমানুষী অভিমান দেখে ফিরে আসবে।

—কই ডাকলি না? মহেন্দ্র আবার বললেন।

—এখুনি ডাকব?

—হ্যাঁ এখুনি নয়তো কি!

উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করে দিলেন মহেন্দ্র। সরোজিনীর পূজার্চনার সময় বয়ে যাচ্ছিল, বিরক্তমুখে তিনি ঘর থেকে

বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, মহেন্দ্র হঠাৎ পায়চারি বন্ধ করে বললেন : দাঁড়া, আজ না হয় থাক। বিশ্বাস তো নেই।' আজই হয়তো নবাবের বেটী মাইনে চাইতে এসে হাজির হবেন। তারপর এইসব কাণ্ড দেখলে আর রক্ষে রাখবে! আজ না হয় থাক—

একটা অনাত্মীয় মেয়েকে এতখানি ভয়, এত ভালোবাসা! সরোজিনী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

হঠাৎ অজয় এসে হাজির। মহেন্দ্র মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন : কখন আসা হল?

—এইমাত্র। তোমাকে ওপরে না দেখে নিচে নেমে এলাম।

—ওপরে আজকাল আমি থাকি না। অপ্রসন্নমুখে জানালেন মহেন্দ্র : আমার ভালো লাগে না। তা এতদিন বাদে বাড়ির কথা হঠাৎ স্মরণ হল বুঝি?

—এতদিন সময় পাইনি—

—সময় পাওনি! তোমার এত পসার জমে উঠেছে! শহরশুদ্ধ লোক তোমাকে দিয়ে চিকিচ্ছে করাচ্ছে বোধহয় আজকাল!

—শহরশুদ্ধ নয়, একজনেরই চিকিৎসা করছি। তাকে তুমিও চেন। তোমার এখানে কাজ করতেন।

—কে? মহেন্দ্র কৌতূহলী হলেন।

সরোজিনী বললেন : জবার কথা বলছিস?

—হ্যাঁ পিসিমা, তার খুব অসুখ।

—কেমন, আমি বলিনি সরো বলিনি! বলবার আগেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মহেন্দ্র : মেয়েটার যে এমনি দুর্দশা হবে, এমনি বেঘোরে ও মারা যাবে, এ আমি জানতাম। তা কোথায়, কোন চুলোয় তিনি আছেন?

—অত্যন্ত নোংরা একটা বস্তির ঘরে।

আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ : শুনলি তো সরো শুনলি? নোংরা একটা বস্তির ঘরে অসুখে মরতে বসেছে। তা বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। অত তেজ করলে কখন ভালো হয়!

কোন দিক থেকে কোন মন্তব্য হোলো না, তিনি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন : আমরা কেউ যাব না সেখানে, মরে গেলেও না। আর তোকেও বলে দিচ্ছি, খবরদার তুই তার চিকিচ্ছে করতে পারবিনি। খবরদার নয়—

সরোজিনী মনে মনে হাসলেন, অজয়ও তাই এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, এত 'খবরদারির' পর নিজেই তিনি মোটর বার করিয়ে অজয়কে সঙ্গে নিয়ে তাতে উঠে বসেছেন।

ব্লাডপ্রেশার বাড়বার পর এই প্রথম মোটরে চড়লেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। বংশী মিস্ত্রীর গলির গণ্ডী বাঁধা জীবনে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল প্রকাণ্ড 'হাডসান' খানা এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে। গাড়িতে বসেই বস্তির চারিদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে বললেন মহেন্দ্রপ্রতাপ : ও! এইখানে এসে উঠেছেন! তা উঠবেন বইকি! পচে মরবার এমন ছুঁচোর গর্ত নইলে পাবে কোথায়! খাতির যত্ন, আরাম-আয়েস, এসব কি সকলের কপালে হয়!

বলতে বলতে নিজেই দরজা খুলে নেমে পড়লেন এবং জখম পাটাকে টানতে টানতে প্রায় উৎসাহী যুবকের মতো অজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে স্থরু করলেন।

সিঁড়ির কাছে এসে অজয় বললে : সিঁড়িটা কিন্তু খারাপ, একটু সাবধানে উঠবেন।

—কেন, সাবধানে উঠবো কেন? কি হয়েছে আমার?

—না না, কাঠের সিঁড়ি তার ওপর ভাঙ্গা।

—ভাঙ্গা সিঁড়ি! মহেন্দ্র গর্জন করলেন : এ রকম ভাঙ্গা সিঁড়ি এখানে থাকে কেন? আজই মেরামত করবার ব্যবস্থা করবে।

—তাহলে নিজেদেরই করতে হয়। অজয় বলে হাসতে হাসতে : বাড়িওয়ালা আর করবে না।

—করবে না? কেন করবে না? কাঠের নড়বড়ে সিঁড়িটার ওপরেই হাতের লাঠিটা সজোরে ঠুকলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ : না করে, আমি পয়সা

দিয়ে করাবো। ও বেটীর জ্বালায় কতদিন এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে হবে তার ঠিক আছে! হুঁঃ—

উৎসাহের আতিশয্যে অজয়কে পিছনে রেখে নিজেই এগিয়ে গেলেন। এবং বারান্দায় পৌঁছেই সামনের ঘরখানায় ধাক্কা দিতে স্থরু করলেন।

অজয় বললে: এটা নয় বাবা, ওঁরা পাশের ঘরে থাকেন।

মহেন্দ্রপ্রতাপ জবাদের ঘরে ঢুকলেন। সাধন জবার মাথায় বাতাস করছিল। অজয় পিছন থেকে বললে: বাবা এসেছেন সাধনদা।

সাধন কিছু বলবার আগেই জবা চাইল চোখ মেলে।

—আপনি এসেছেন! জবার মতো নিরুত্তাপ মেয়েকেও বিস্ময়ে বিহ্বল হতে হোলো।

মহেন্দ্র এতক্ষণ হৃতশ্রী ঘরখানা আর জবার রোগশীর্ণ মুখখানি চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। এবার যথারীতি চেঁচিয়ে উঠলেন:

—হ্যাঁ এসেছি। এসে খুব অন্যায় করেছি। আশা আমার উচিত ছিল না। তোমার মতো নেমক-হারাম, নির্বোধ, একগুঁয়ে মেয়ের এই দশা হবে না তো হবে কার! আমি খুব খুশী হয়েছি।

মহেন্দ্রর চোখেমুখে খুশী হবার কোন লক্ষণ দেখা না গেলেও অজয় বিব্রত হয়ে বললে: বাবা, উনি অসুস্থ—

—অসুস্থ! অসুস্থ হতে কে ওকে বলেছিল! ভাঙ্গা মেজেয় সজোরে লাঠি ঠুকলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ: কি দোষ আমি করেছিলাম যে না বলে কয়ে এই চুলোয় এমন করে মরতে এল? এত বড় যে অসুখ করেছে আমায় একবার জানায়নি পর্যন্ত!

—আমার সত্যি অন্যায় হয়েছে। আমায় আপনি ক্ষমা করুন।

কঠিন মেয়ে জবার চোখেও জল!

—ক্ষমা করবো! মহেন্দ্র আবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন: ক্ষমা করলেই যেন আমার সব আফশোষ মিটে যাবে! আমার তখুনি একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল যাতে বেটী কোথাও আর যাবার নামটি না করতে পারে।

কিন্তু আমার ছেলেটি যে হয়েছে একটি কাঠগোঁয়ার! যা বলব তাতেই হয়তো বেঁকে দাঁড়াবেন।

অজয় বিব্রতভাবে বললে: তুমি বস বাবা, আমি একটু দেখেনি এঁকে—

—কে দেখবে? তুমি! তুমি এর চিকিচ্ছে করছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই তো করছি—

—সর্বনাশ করেছ! তাই মেয়েটা এত ভোগান ভুগছে।……না, না, আজই ভালো ডাক্তার ডাকবার ব্যবস্থা কর, এখুনি।

—তা করুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করলেও পারতেন।

—হ্যাঁ, পারতাম! তোমার মতো চ্যাংড়া ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিই, তারপর—না, না, এখুনি অন্য ডাক্তার আনাও।

সাধন অনেকক্ষণ থেকেই কিছু একটা বলবার জন্যে উসখুস করছিল, এবার আর চুপ করে থাকতে পারলো না।

—দেখুন, এদিকে একটা মুস্কিল হয়েছে—

—কি মুস্কিল?

—আজ বাড়িওলা শয়তানি করে, প্লেগ না কী বলে খবর দিয়েছে, এখুনি এমবুলেন্সের লোকজন নিতে আসবে।

—কে নিতে আসবে? যা তা খবর শুনে নিতে এলেই হোলো।

—আজ্ঞে আমি মুখ্যু লোক, গরীব। যদি জোর জুলুম ক'রে প্লেগ বলে নিয়ে যায়, কিছু করতে পারবো না। তা ছাড়া বাড়িওলার ছেলেটার আমাদের ওপর যা রাগ, ও বদমায়সী করে সব করতে পারে।

—হুঁ, বদমায়সী আমি বার করছি! মেজের ওপর আবার মহেন্দ্রের লাঠির শব্দ হোলো: ওই ভাঙ্গা কাঠের সিঁড়ি যার সেই বাড়িওলা না? কান ধরে তাকে এখানে নিয়ে এসো—

মহেন্দ্রের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ল তার হাতে বন্দুক থাকলে বাড়িওলাকে এখন আর প্রাণে বাঁচতে হোতো না। অজয় তাঁর কাছে গিয়ে

ব্যাকুলভাবে বললে: বাবা, আপনার শরীর খারাপ, আপনি উত্তেজিত হবেন না—

—উত্তেজিত হবো না! একশোবার উত্তেজিত হবো! মহেন্দ্র গলার পর্দা সপ্তমে চড়িয়ে দিলেন: কোথায় সে বাড়িওয়ালা—

ঘরের মধ্যে যখন এই নাটকীয় দৃশ্য, ঘরের বাইরে তখন রত্নেশ্বর মুখুজ্যে সেই ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন। প্রতুল তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে। রত্নেশ্বর অবাক হয়ে চারিদিকে দেখছিলেন, আর ভাবছিলেন, তাঁর ভাইঝি কেমন করে এই নোংরা বস্তির মধ্যে দিন কাটায় কে জানে।

ঘরের মধ্যে অজয় বাপকে শান্ত করবার চেষ্টা করল আর একবার: তুমি একটু স্থির হয়ে বসো। বাড়িওয়ালা আসুক না, তারপর দেখা যাবে—

হঠাৎ উত্তেজনার পর অবসন্ন হয়ে মহেন্দ্র জবার চৌকির পাশেই বসতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় প্রতুলের সঙ্গে রত্নেশ্বরের প্রবেশ। মহেন্দ্রর বসা হোলো না, তিনি লাঠি ঠুকে, চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলেন: গেট আউট, গেট আউট—

রত্নেশ্বর ঘাবড়াবার লোক ন'ন, তবু তাঁকে হকচকিয়ে যেতে হোলো। প্রতুল তাঁর আড়ালে গা ঢাকা দিলো। মহেন্দ্র রত্নেশ্বরের সামনে গিয়ে লাঠি উঁচিয়ে হাঁকলেন: বদমায়েসী করবার আর জায়গা পাওনি! গেট আউট, বেরও, দূর হও—

রত্নেশ্বরেরও আর ধৈর্য্য রইলো না। ভাইঝিকে দেখতে এসে এমন কিছু অন্যায় করেন নি যে তার জন্যে এমনি সম্বর্ধনা তাঁর পাওনা হতে পারে।

তিনিও চীৎকার করে উঠলেন: ইউ গেট আউট!

এমন কথা যে কেউ তাঁকে বলতে পারে, তাও একেবারে মুখের ওপর, এটা মহেন্দ্রর ভাবা ছিল না। তিনি বললেন: য়্যাঁ। কি বললে।

—বলছি, গেট আউট—

—গেট আউট। সিংহনাদ করলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ: জানেন আমি কে?

ওপক্ষ সমান জোর গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলে : আমি কে জানেন ?

—জানি, বদমায়েস বাড়িওয়ালা—

মহেন্দ্রপ্রতাপের রাগের কারণটা এতক্ষণে বোঝা গেল। সাধন তাড়াতাড়ি বললে : আজ্ঞে, উনি বাড়িওয়ালা ন'ন—

—বাড়িওয়ালা নয় তো কে উনি ?

—উনি জবার কাকা। প্রতুল তাড়াতাড়ি বলে উঠলো : ও জবা, এই তোর কাকাবাবু, অনেকদিন ধরে তোর খোঁজ করছিলেন। আমি ঠিকানা দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি—

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। জবা যেন আর সামলাতে পারে না। কোথায় যেন দেখেছে লোকটিকে···মনে করবার চেষ্টা করে চোখ বুঁজে।

মুখ দিয়ে শুধু বলতে পারে : কাকাবাবু !

—হ্যাঁ, মা, তুমি আমায় চিনতে পারবে না। রত্নেশ্বর বললেন : আমিই তোমার কাকাবাবু। তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

জবা কিছু বলবার আগেই মহেন্দ্রর গর্জন শোনা গেল : আপনি নিয়ে যাবেন মানে ? আমি ওকে নিয়ে যাব।

—আপনি নিয়ে য়াবেন ! রত্নেশ্বর বললেন : আপনি নিয়ে যাবেন কি রকম ? আপনি এখান থেকে নিয়ে যাবার কে ?

—আমি কে ! মহেন্দ্রর বিস্ময়ের যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না।

কি বলবেন ঠিক করতে পারেন না। মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ভেবে নিয়ে বলেন :

—আমি—আমি—আমার ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। এইবার !

শেষ কথাটা বললেন এমনভাবে যেন মস্ত একটা লড়াই জয় করে অসহায় বন্দীর প্রতি তিনি কৃপা করতে চাইছেন।

রত্নেশ্বরও পিছু হটবেন না। তিনি বললেন : বিয়ে দেবেন ! বিয়ে অমনি দিলেই হল ! কি রকম ছেলে, কি রকম বাড়ি না জেনেই আমি বিয়ে দেব ভেবেছেন !

খুব অপমানিত বোধ করলেন মহেন্দ্র, রাগে চোখ দু'টো আবার রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো।

—আমার ছেলে কি রকম আপনি দেখবেন—আমার ছেলে আপনার পছন্দ নয়!

পৃথিবীর আর কোন ছেলের বোধহয় এমন অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ হয় নি। অজয়ের চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। জবাও কম বিব্রত বোধ করছিল না। দু'টি পরিণত বয়স্ক পুরুষের এই শিশু-সুলভ লম্ফ-ঝম্প দেখতে দেখতে তার প্রায় দম আটকে আসছিল। দমটা আটকে আসছিল চাপা হাসিতে। কিন্তু অজয় ভাবলে অন্যরকম। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল: বিয়ে তো দেবেন। কিন্তু এঁকে মেরে ফেলে তারপর দেবেন কি! তোমাদের মারামারিতে এঁর অবস্থাটা কি হচ্ছে বুঝতে পারছো।

ছিঃ, ছিঃ, সত্যিই তো! দু'জনের কারও খেয়াল হয় নি!

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি জবার দিকে এগিয়ে গেলেন।

রত্নেশ্বর সলজ্জভাবে বললেন: নাঃ, সত্যিই আমাদের খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

হাসি চাপবার জন্যে জবা তাড়াতাড়ি মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

কি করে আপোষ করা যায় সেই কথাই বোধ হয় ভাবছিলেন ভাবী দুই বেয়াই।

বলাইয়ের ভাই ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলো।

—বাড়িওয়ালা লোকজন নিয়ে আসছে সাধনদা।

ব্যস, আর কিছু বলতে হোলো না। মহেন্দ্র বললেন: কই—কোথায়?

রত্নেশ্বর বললেন: কি হয়েছে কি?

অজয় বললে: বাড়িওলা প্লেগের রুগী বলে আপনার ভাইঝিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে এসেছে।

নগেন দলবল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। এমবুলেন্সের কুলী দুটোকে বললে, ইধার যাও, বেমারি হিঁয়া হ্যায়।

মহেন্দ্রর লাঠি উচু হয়ে উঠলো।

—বেমারা হাসপাতালে পাঠাতে এসেছ! এই যে হাসপাতালে তোমাদেরই পাঠিয়ে দিচ্ছি! ঘা কতক কষিয়েই দেন বুঝি লোক দু'টিকে!

—আহা আপনি কেন! আপনি কেন! রত্নেশ্বর নগেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন: তুমি বাড়িওয়ালা? প্লেগের রুগী বলে তুমি খবর দিয়েছ?

নগেন বললে: প্লেগ না কি হাসপাতালে গেলেই জানা যাবে। এখানে এসব রুগী রাখা চলবে না।

—পাজী! রাস্কেল! ছুঁচো! এবার তিনটি কথাই প্রায় একসঙ্গে উচ্চারিত হ'ল মহেন্দ্র আর রত্নেশ্বরের মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে এক গোছা মোটা লাঠি আর এক গোছা ছড়ি নগেনের মাথার ওপর উদ্যত হল।

—দেখুন ভাল হবে না! নগেন আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করলো।

রত্নেশ্বর বললেন: ভাল তো হবেই না।

মহেন্দ্র বললেন: হাসপাতালে পাঠাতে এসেছ?

রত্নেশ্বর হাক দিলেন: হাসপাতাল পর্যন্ত তোমায় পৌছতে হবে না। গেট আউট!

দুই বৃদ্ধের উদ্যত যষ্টির সামনে থেকে নগেনের সদলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ভিন্ন উপায় রইল না।

রত্নেশ্বর বললেন: হুঃ, হাসপাতালে পাঠাবে!

মহেন্দ্র বললো: হ্যাঁ, আমরা যেন মরে গেছি!

অজয় বললে: তোমরা মরনি, কিন্তু একে তো বাঁচাতে হবে। জবার দিকে চাইল অজয়।

মহেন্দ্র সচকিত হয়ে উঠলেন: হবে বৈকি। নিশ্চয় হবে। আপনার নামটা তো—

—রত্নেশ্বর মুখার্জি।

—আমার নাম মহেন্দ্রপ্রতাপ চৌধুরী। নমস্কার।

রত্নেশ্বর অজয়ের দিকে চাইলেন: এইটি বুঝি আপনার ছেলে?

—হ্যাঁ, ও আবার ডাক্তার। কিন্তু ওর চিকিৎসাতে মাকে আমার

রাখছি না। ওর চিকিৎসাতে' নয়। মহেন্দ্র জবার দিকে চাইলেন: কি মা, ওর চিকিৎসায় বিশ্বাস হয়?

—হয়। লজ্জিত, আরক্ত মুখে জবাব দিলে জবা।

—হয়! বেটী বলে কি। খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলেন মহেন্দ্র।

জবা বললে: আর কিন্তু বেটী বললে আমি রাগ করবো না, ঠিক সেরে উঠবো।

—সেরে উঠবে ঠিক! ঠিক তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে তো? আনন্দের আতিশয্যে সজোরে লাঠি ঠুকলেন মহেন্দ্র: তা হলে যা একটা ভোজ দেব বুঝেছ মা! অনেক দিনের সাধ! ভোজের কল্পনায় চোখ দুটো মহেন্দ্রর বড় বড় হয়ে উঠলো।

কথায় এবং কাজে এবার কোনরকম ফারাক থাকলো না। জবা সেরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই রীতিমত ভোজের আয়োজন করলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ—দেখবার এবং দেখাবার মতো ভোজ। অনেকদিন পরে ডাইনিং হলে আলো জ্বললো, প্রকাণ্ড লম্বা টেবলের ওপর চাদর পড়লো, ফুলদানি, চায়না আর কাটগ্লাসের পাত্রে ঝলমল করে উঠলো ঘরখানা। মোগলাই কাবাব থেকে কাশ্মীরী পোলাও, ভেটকী ফ্রাই থেকে মোরগ-মোসল্লম, ভাপা ইলিশ থেকে রোগান জুস, কিছুই বাদ গেল না। কেতাব দেখে দেখে রান্নার ফরমাস দিলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। ভোজের দিন দেখা গেল, সাধন থেকে মন্মথ, প্রতুল রত্নেশ্বর থেকে সুরু করে বিমলা-কুন্তলা কেউ আর বাদ পড়েনি। চাকর-বাকরগুলো থেকে আরম্ভ করে সরোজিনী পর্যন্ত সবাই মহেন্দ্রর হুকুম তামিল করতে করতে ঘেমে উঠলো।

একেবারে সাহেবী মতে রাত আটটায় খাওয়া দাওয়া সুরু হবার কথা। মহেন্দ্র কিন্তু সন্ধ্যে সাতটা থেকেই ডাইনিং হলে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন, জখম পায়ের কথাও আর মনে রইলো না।

রত্নেশ্বর এসে পৌঁছলেন পৌনে আটটায়। আয়োজনের ঘটা দেখে

তাঁরও চক্ষুস্থির। মহেন্দ্র বললেন, বসুন, বসুন। অল্প সময়ের মধ্যে কিছুই বিশেষ করতে পারা গেল না।

চাকর-ঠাকুর-বেয়ারা-বাবুর্চির দিকে চেয়ে হাঁক দিলেনঃ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন! খাবার দাবারগুলো আগে থাকতে ব্যবস্থা করে সাজিয়ে রাখতে হয়।

সরোজিনী বললেনঃ সাজাবার আগেই যে তুমি হুড়মুড় করে সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়লে। তোমার যে আর তর সয় না।

—আগেই এসে পড়েছি বুঝি—! অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন মহেন্দ্রঃ একটু আগেই আসতে হয় রে, একটু আগেই আসতে হয়। খাবার জিনিস সামনে সাজান গোছান দেখতেই মজা। তা নইলে, শুধু খেয়ে আর কি সুখ!

কুন্তলা আর বিমলার দিকে চেয়ে বললেনঃ কিন্তু তোরা কোন কাজের নয়। সে বেটী না থাকলে সব গোলমাল হয়ে যায়। তা কোথায় গেছেন সেই রাজনন্দিণী?

সরোজিনী বললেনঃ তোমার রাজনন্দিণী ব্যবস্থা করতেই গেছেন। আসছেন এখুনি। তুমি এখন বোসো দেখি।

—এই যে বসছি। সাধন দরজার কাছে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়িয়েছিল, সেদিকে চোখ পড়তেই মহেন্দ্র বললেন, আরে তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন সাধন? বস, বস—

—আজ্ঞে না, আমি বেশ আছি।

—বেশ আছি মানে! মহেন্দ্র তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেনঃ তুমি না বসলে হয়।

—আজ্ঞে না। আমি কি আপনাদের সঙ্গে বসতে পারি! সাধন লজ্জায় একেবারে জড়সড়।

—খুব পার। মহেন্দ্র বললেন হাসতে হাসতেঃ তুমি হলে আমার মা বেটীর আসল দাদা।

জোর করেই তাকে টেবলে বসালেন। প্রতুল বললেঃ বাঃ, বেশ তো!

সাধনদা দাদা হোল, আর আমি বুঝি ভেসে গেলাম। আমি না থাকলে আপনাদের দেখাশুনোই হোত না কিন্তু।

—তা হোত না বটে। রত্নেশ্বর স্বীকার করলেন।

মহেন্দ্র বললেন : সেই জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছি হে!

সাধনকে তিনি একেবারে তার জামাই মন্মথর পাশে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মন্মথ অস্বস্তি বোধ করছিল, এই সুযোগে উঠে পড়বার চেষ্টা করলো। কিন্তু শ্বশুরের চোখ এড়ান গেল না। তিনি বললেন, তুমি আবার উঠছো কেন মন্মথ?

—না থাক, আমি পরেই খাব'খন।

সাধন ব্যাপারটা বুঝলো, তাড়াতাড়ি বললে : না, না, আমি উঠি—

—উঠবে মানে! মহেন্দ্রর চোখের দৃষ্টি আবার ধারালো হয়ে উঠলো। জামাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, প্রায় ধমকালেন বলা যায় : তুমি বসবে কি না মন্মথ?

—আজ্ঞে না। এ রকমভাবে বসা আমার অভ্যাস নেই।

—কি বললে! মহেন্দ্রর গলায় আবার সেই সাবেক গর্জন।

সরোজিনী, কুন্তলা, বিমলা সবাই বিব্রত। কুন্তলা বললে : আহা বোসই না।

বিমলা বললে : বসো না মন্মথ।

মহেন্দ্র বললেন : বসবে না মানে! ওর ঘাড় বসবে। বসো—

আত্মসম্মান বজায় রাখা আর হল না। ঘাড় নিচু করে পুনশ্চ বসতে হল মন্মথকে।

রত্নেশ্বর বললেন : এইবার আপনি বসুন।

—এই যে বসছি। বসতে গিয়ে কিন্তু চোখ দুটো ছলছল করতে লাগলো মহেন্দ্রর : আমার আর বসে লাভ কি! দেবে তো সেই ষ্টু নয় স্যুপ আর আলুনী স্যালাড! কিন্তু আপনাদের জন্যে আমি নিজে সব ব্যবস্থা করেছি—ও বেটীই অবশ্য তদারক করেছে।

শেষ কথাটা বললেন রত্নেশ্বর এবং কথাটা শেষ হবার আগে জবা

ঠাকুরকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ঠাকুরের হাঁতের ঢাকা-দেওয়া পাত্রগুলি মহেন্দ্রর সামনে নামাতে নামাতে জবা বললে : বসুন।

মহেন্দ্র বসলেন। চোখ ফেটে জল আসে আর কি! এই জমজমাট ভোজের আসরে পোলাও-কালিয়া-কাবাবের সুগন্ধ সমারোহের মাঝখানে তাঁর জন্যে নিশ্চয়ই সেই লবণবর্জ্জিত ষ্টু আর—

পাত্রের ঢাকাগুলো খুলতেই কিন্তু মহেন্দ্রর মুখের চেহারা বদলে গেল। আরে এ যে কাশ্মীরী পোলাও, মটন্ কোপ্তা, মোরগ-মসল্লম—সব, যা ঠিক আর পাঁচজনেরই মতো!

—অ্যাঁ! এই সব—!

—এ সবই আপনার জন্যে। জবা মিষ্টি করে হাসলে।

—আমার জন্য। মহেন্দ্র যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না : আমি এসব খাব।

—হ্যাঁ, আমি দিচ্ছি যখন, খান না।

তবু যেন মহেন্দ্রর বিশ্বাস হয় না। তিনি অসহায়ভাবে একবার সরোজিনীর মুখের দিকে চাইলেন, তারপর ছেলে-মেয়ের দিকে। তারা কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, রক্ষা করলেন রত্নেশ্বর।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খানা ভাল করে খেলে কিছু হয় না। না খেয়ে যারা উপোষ করে মরে তাদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

—বলুন তো! বলুন তো! উৎসাহে জ্বলে উঠলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ, যেন বিশ বছর বয়স কমে গেল : আরে এই রকম না হলে বেয়াই। দেখেছিস সরো, কি রকম বেহাই করেছি দেখেছিস!

জবা এবং অজয় অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলো। মহেন্দ্র কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দিলেন না। রত্নেশ্বরের চেয়ারটা ঠিক তাঁর পাশেই ; রত্নেশ্বরের হাতটা চেপে ধরে বললেন : আর কিন্তু আপনাকে বর্মায় যেতে দিচ্ছি না!

—পাগল। এমন মেয়ে-জামাই, তার ওপর এমন বেয়াই ছেড়ে আমি

স্বর্গেও যাব না। ভরাট, দরাজ গলার হাসিতে ডাইনিং হল কাঁপিয়ে দিলেন রত্নেশ্বর।

পেস্তা-বাদাম-ঘৃতসিক্ত পোলাওয়ের পাত্রটার ওপর দৃষ্টি পড়লো মহেন্দ্রর সুরভিতে প্রাণ যেন আনচান করে উঠলো। কতকাল পরে—

মহেন্দ্র বললেন : তা হলে খাই–

একবাক্যে সায় দিল সবাই।

॥ সমাপ্ত